চাবি

আশাপূর্ণা দেবী

সেরা
প্রকাশক প্রাইভেট লিমিটেড
৮২/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০০০৯

চাবি : আশাপূর্ণা দেবী : দ্বিতীয় মুদ্রণ : অগ্রহায়ণ ১৩৬৯
"সেরা প্রকাশক প্রাইভেট লিমিটেড" ৮২/১ মহাত্মা গান্ধী
রোড, কলিকাতা-৯ এর পক্ষে থেকে শ্রীশিশির ভট্টাচার্য প্রকাশ করেছেন এবং
এম, এম, টেডার্স, ৩/২, ক্ষুদিরাম বোস রোড, কলিকাতা-৬ থেকে শ্রী অশোক
মিত্র ছেপেছেন। প্রচ্ছদ শিল্পী : সুরজিৎ অধিকারী।

স্নেহের উষসীকে
ভালবাসার সঙ্গে—

এই লেখিকার :

মান-সম্ভ্রম

এক সমুদ্র অনেক ঢেউ

এখানে ওখানে সেখানে

সৃষ্টিছাড়া

ভোরবেলায় ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে অভ্যাসমত বালিশের তলায় হাতটা বুলোলেন দেবীপদ, হাতটায় মসৃণ বিছানার স্পর্শ ছাড়া আর কিছু পেলেন না। বুকটা ধড়াস করে উঠল, কোথায় রেখেছি আজ?

ঘরে এখনো আলোর আভাস পৌঁছয়নি, কারণ জানলায় মোটা মোটা পর্দা ঝুলছে। এই নতুন দোতলায় ছেলেমেয়েদের শখে জানালাগুলো শুধু কাঁচের, কাঠের পাল্লার বালাই নেই। অতএব মোটা কাপড়ের পর্দা ছাড়া গতিও নেই। দুপুরে রোদ বাঁচাতে, ভোরে আলো বাঁচাতে। সন্ধ্যায়-রাতে পড়শীদের কাছে আব্রু বাঁচাতে। একটু বেশীই বাঁচাতে হচ্ছে। দেবীপদর বাড়ির পুবধারে যে মাঠটা পড়েছিল এ যাবৎ, দেবীপদর দোতলা তোলার সময়ও পড়েইছিল, এবং থেকে দেবীপদকে রক্ষা করেছিল। ওটা না থাকলে দেবীপদ দোতলার মাল মশলা, লোহা লক্কর, ইঁটের পাঁজা, পাথর-কুচির পাহাড় রাখতেন কোথায়? রীতিমত একটা সমস্যাই হয়ে দাঁড়াত।

কিন্তু সেই সুখ অস্তমিত, এখন সেখানে আকাশ ছোঁওয়া ফ্ল্যাট-বাড়ি উঠে পড়েছে। প্রস্থে বাড়বার তো জায়গা পায়নি, তাই যতটা পেরেছে উচ্চতায় বেড়েছে। দূর থেকে দেখলে হঠাৎ যেন একটা কারখানার চিমনি বলে মনে হয়।

এই চিমনিই দেবীপদর বাড়ির আব্রুর হন্তারক। বিশেষ করে আবার এই ঘরটারই। অন্য ঘরগুলোর তবু অন্যদিকে জানলা আছে। এর আবার ওই পুবছাড়া বাইরের দিকে আর কোন দিক নেই।

প্রথমটাতো বলেছিলেন, নতুন দোতলায় নতুনরা থাকুক, আমি পুরনো মানুষ, পুরনো ঘরেই থাকি। সে প্রস্তাব ধোপে টেঁকেনি। এক্ষেত্রে দেবীপদর 'আমি'টা তো শুধু দেবীপদই নয় নীহারকণাও তো?

নিজে অবশ্য নীহারকণা কিছুই বলেন নি ; তাঁকে জিজ্ঞেস করায় মতামত দেবার ব্যাপারটা এড়াতে মৃদু হেসে বলেছিলেন, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম।

তা' শেষ পর্যন্ত সেটা হলনা ; মেয়েরা বলল, ইস্। মার চির-কালের কত সাধ দোতলার বারান্দা থেকে রাস্তা দেখবে।

সত্যিই ছিল তেমন সাধ নীহারকণার, জীবনের সমস্ত ভাল সময়টাই তো একতলাতেই কেটে গেছে। সময় পেলেই ছাদে উঠে যাওয়া একটা বাতিক ছিল। তবে ছাদটা ন্যাড়া, রাস্তা থেকে প্রায় পা অবধি দেখতে পাওয়া যায়, ঘুরে বেড়ালে ঠিক যেন সম্ভ্রম থাকে না। কাজেই ওই ছাদে ওঠাটায় খুব একটা স্বস্তি ছিল না। তাছাড়া পড়ে যাওয়ার ভয়ে দেবীপদর অবিরত টিকটিকিনি।

যখন তখনই তাই নীহারকণা বলেছেন, দোতলায় যদি অন্তত একখানা ঘর আর একটু বারান্দা করা যেত! বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখতাম।

দোতলাটা হল।

হল দেবীপদর রিটায়ারের পর।

সারাজীবনের সঞ্চয়, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, গ্র্যাচুয়িটি আরো কী সব নিয়ে থুয়ে থোক অনেকগুলো টাকা এসে গেল সংসারে। তা কর্তার টাকা মানেই তো সংসারের সম্পত্তি, দেবীপদ তা' থেকে নিজের জন্যে আলাদা করে কিছু করতে যাবেন না কি? বেশী বাসনার মানুষ নয়, টুকটাক ইচ্ছে তো ছিল কিছু কিছু। সে আর বলতে সাহস করে উঠতে পারেন নি। ঠিক 'সাহস' শব্দটাও ব্যবহার করা চলে না, বলা যায় লজ্জাই করেছিল।

'আমার টাকা থেকে আমার ইচ্ছে পূরণের জন্যে কিছু থাক', একথা বলা যায় না কি? সঙ্গে সঙ্গেই বাতাস ভারী ভারী হয়ে উঠবে না?

পরামর্শ সভা থেকে ছেলেরা ছুতো করে উঠে যাবে না? ছেলের

বৌ মিষ্টি হেসে বলবে না, তা'তো সত্যিই বাবা, আপনার টাকা আপনি ইচ্ছেমত খরচ করবেন বৈকি।

আর তারপর?

তারপর নীহারকণার কাছে মোক্ষম অন্তরটিপুনি খেতে হবে না, এই বেকুবের মত কথা বলার জন্য?——দেবীপদ গণৎকার নয়, তবু দেবীপদর সামনে এ ছবি আর্শীতে পড়া ছাতার মতই ভেসে উঠেছিল।

অতএব দেবীপদ ওই টাকাপত্রের কাগজপত্র সংসার সদস্যদের সামনে এনে ফেলে দিয়ে প্রসন্ন উদারতায় বলে উঠেছিল, নাও, তোমাদের জিনিস তোমাদের হাতে এনে দিলাম, এখন কী করবে কর।

তবে?

কী আর করা হবে বাড়ির দোতলা তোলা ছাড়া? যার আকাঙখায় বাড়ির প্রতিটি সদস্য দিন গুণছিল অলক্ষিত জগতে সঞ্চিত হতে থাকা ওই অর্থভারের আসার লগ্নের অপেক্ষায়।

'দোতলায় ঘর না তুলে ছেলের বিয়ে দেওয়া অসম্ভব', এই ঘোষণার পরও, ঘর না তুলেই ছেলের বিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন দেবীপদ, সাঁড়াশী আক্রমণের দায়ে। এক দিকে ছেলের মাথার চুল পাতলা হয়ে আসা এবং ভুঁড়িতে নেওয়াপাতির আভাস দেখা দেওয়া অপরদিকে কন্যাদায়গ্রস্ত অভাগা ভদ্রলোকেদের আনাগোনার উৎপাত। পরের বাড়ির মেয়েদের ফোটোয় ড্রয়ার ভরে উঠেছে, গণগোত্র রাশি নক্ষত্রদের প্রতিকুলতাও অতিক্রম করে যাচ্ছে অনেকে, আর কত ঠেকাবেন হতভাগ্য দেবীপদ?

তার ফাঁকে ফাঁকে নীহারকণার ন্যায়-যুক্তির কুটুস কামড় তো ছিলই।——তিনিও অবশ্য 'এইটুকুর মধ্যে ছেলের বিয়ে?' ভেবে শিহরিতই হয়েছেন, কিন্তু হলে কী হবে, তিনি যে আবার 'ধর্ম'জ্ঞানী।

যাক 'সেইটুকুর মধ্যেই' ছেলের বিয়ে দিয়ে ফেলতে হয়েছিল,

এবং নবদম্পতির কুজন গুঞ্জনেও যে বিশেষ ঘাটতি ঘটেছিল তা'নয়। শুধু বড় হয়ে যাওয়া মেয়ে দুটোকে নিজের ঘরের মধ্যে আনতে হওয়ায় ধর্মজ্ঞানী নীহারকণাও হাঁপিয়ে উঠেছিলেন ——ছোট ছেলেটির যে আবার বেপরোয়া ঘোষণা, 'এ ঘরে বাবার সঙ্গে আমি ? মানে আমার সঙ্গে বাবা ?' নেভার। বলতো লক্কাদের বাড়ি শুতে চলে যাব।—

শোবার আগে সে আধ প্যাকেট সিগারেট ধ্বংসায়, এবং এক দিস্তে কাগজ ধ্বংসে একআধটা কবিতা লেখে। তার নিজস্ব ঘর ব্যতীত অচল।

যাইহোক, সে সব সমস্যার সমাধান হয়েছে। তবে দোতলার বারান্দায় পূর্ণ সুখটা ঠিক নীহারকণার ভোগে আসেনি, কারণ দক্ষিণে জানলা পূর্বে বারান্দাওয়ালা ঘরটাতো আর নীহারকণা ছেলে-বৌকে না দিয়ে নির্লজ্জের মত নিজের ভাগে রাখতে পারেন না? দক্ষিণে একচিলতে বারান্দা সম্বলিত ঘরও অবশ্য একটা আছে, ঘাড় বাঁকালে রাস্তা দেখা যায়, কিন্তু ঘরটাও যে আবার একচিলতে। তার মধ্যে নীহারকণার দীর্ঘ সংসার জীবনের বিপুল বস্তুভার নিয়ে ঢোকা তো সম্ভব নয়।

তাছাড়া ঘরটা একেবারে ছেলে-বৌয়ের ঘরের গায়ে অসুবিধে-জনক। পুরনো ছাঁচের ওপর কতটুকুই বা আধুনিক করা যায়? দেয়ালগুলো তো বদল করা যাবে না?

অতএব দালানের এ ধারে, সিঁড়ির দেয়ালের গায়ের ঘরটাতেই দেবীপদ এবং নীহারীকা। মাপেও ঘরটা বড়ই। বড় না হলেও, হাঁফ ছেড়ে বাঁচতেন। ছেলের বিয়ে হওয়া ইস্তক দুই মেয়েকে ঘরে ঠাঁই দিয়ে, প্রতিনিয়তই তো নিজের গালে ঠাঁই ঠাঁই চড় বসাতে ইচ্ছে হতো।

যেন দুটি নাগিনী।

দাদার বৌ উড়ে এসে জুড়ে বসে তাদের এই দুর্গতি ঘটিয়েছে,

এটাই তাদের পক্ষে চিত্তদাহকারী। তার ওপর গাত্রদাহকারী, বাবার নাক ডাকা, এবং ঘুম আসার কালে মায়ের বহুবিধ স্বগতোক্তি। সেই চিত্তদাহ আর গাত্রদাহ তারা প্রকাশ করতে তো ছাড়তো না।

মাথায় থাক আমার বারান্দা থেকে রাস্তা দেখা, ভেবেছিলেন নীহারকণা, শুধু নিজেরা দুটো মানুষ একা একটা ঘরে দোরে খিলটা লাগিয়ে শুয়ে পড়তে পারলেই বাঁচি।

সেই বাঁচার ঘরেই সব রক্ষার দায়। সেই দায়েই সর্বদা ঘরের জানলায় মোটা পর্দা ঝুলিয়ে রাখা।

খাট থেকে নেমে পর্দা সরিয়ে ঘরে আলো আনার বদলে দেবীপদ হাত বাড়িয়ে বেড্ সুইচটা জ্বালতে গেলেন, হ্যাঁ এসব হয়েছে এখন, বেড্ সুইচ্ অ্যাটচ্ড্ বাথ্ মোজাইক মেজে, দেবীপদ যাকে বলেন 'মরণকালে জ্বরছেদ।'

নীহারকণা অবশ্য ঠিক তার বিপরীত মতই পোষণ করেন, বলেন, যাক বাবা চিরকালের যা যা সাধ, তার কিছুটা তবু মিটল।

তা বলে এসবে সুবিধে কি আর হয়না দেবীপদর? না সেটা অনুভব করেন না। তবে মুখে সহজে স্বীকার করেন না। তাছাড়া হয়তো 'বস্তুপুঞ্জের' ভারে গঠিত 'সুবিধে টুবিধে' গুলো পুরুষ মনে বিশেষ ছায়াপাত করতে পারেও না। চির অভ্যস্ত পচা পরিবেশের মধ্যেও সে মন বেশ সুখেই কাটাতে পারে। তার উপভোগের ধারণা আলাদা।

অবশ্য ব্যতিক্রমই কি আর নেই? দেবীপদর সমবয়সী মামাতো ভাই পরিতোষ, সে তো আজীবনই পরিতুষ্ট হবার পিছনে ছুটলো, অথচ তার মুখে পরিতোষের ছাপ দেখা গেলনা কখনো।

সুইচটা টিপতে গিয়ে হাতটা সরিয়ে নিলেন দেবীপদ, মনে পড়ে

গেল ওই মসৃণ বিছানার স্পর্শটুকু ছাড়া বালিশের তলায় আর কিছু পাবার নেই আজ। সেই পরম সম্পদখানি দেবীপদর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

অথচ গডরেজের আলমারীর নয়। ব্যাঙ্কের লকারের নয়। পুরোনো কালের বাক্স প্যাঁটরা কাঠের সিন্দুক টিন্ধুকের নয়। নিতান্তই অর্বাচীন দুটো মোটামুটি দামের তালার চাবি।

দুটোই বা বলা যায় কোথা? দেড়খানা। লেটার বক্সের তালার চাবিটাকে তো আর গেটের তালাব সমান মর্যাদা দেওয়া যায় না?

রিঙটিঙ কিছুনা, সুতলী দড়ি বাঁধা ওই দেড়খানা চাবি ছিল দেবীপদর অধিকারে। ভোরবেলা গেটটা নিজে হাতে খোলেন দেবীপদ, আর রাত্তিরবেলা নিজেব হাতে বন্ধ কবেন। এটা ওঁর বরাববের অধিকার। এই নতুন দোতলা হবার পর থেকে নয়, রিটায়ার্ড বেকার বুড়ো হিসেবেও নয়, স্বাভাবিক নিয়মেই। গৃহকর্তা হিসেবে।

একতলাতে সামনেব দিকের বসবার ঘবটায় দীপু আস্তানা গাড়ার পর নীহারকণা একবার প্রস্তাব করেছিলেন, এ কাজটা তো এখন থেকে দীপু করলেও পারে। সামনেই থাকে; রাত দুপুর অবধি জাগে—।

সে প্রস্তাব অবশ্য নস্যাৎ হয়ে গিয়েছিল।

'রাতদুপুর' অবধি জাগে ঠিক কথা, এদিকে যে 'দিনদুপুর' অবধি ঘুমোয়! ওর কাছে গেটের চাবি থাকলে, কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে চাইতে যাবে কে?

লেটার বক্সের চাবিটা তো আবার শুধুই ক্ষুদে নয়; অর্বাচীনও। লেটার বক্স বসানো হয়েছে দোতলা তোলার সময়। মিস্ত্রীদের দিয়ে বাইরের দেওয়ালে গর্ত কাটিয়ে ভিতরে খোপ বসিয়ে। আগে তো পিয়ন বসবার ঘরের জানলা গলিয়ে ফেলে দিয়ে

যেত, সবাই নীচের তলায় থাকত মুহূর্তেই তুলে নেওয়া হয়ে যেত চোখে এড়াত না।

এক তলায় তো এখন শুধু রান্না খাওয়া, নীহারকণার ঠাকুর পর্যন্ত ছাতের ঘরে উঠে গেছেন, কখন কে চিঠি কুড়োবে?

ভবিষ্যৎ চিন্তা করেই লেটার বক্স।

চিন্তাটা ছেলে মেয়েদের। দেওয়াল কাটার পরিকল্পনাটা দেবীপদর। তাই তিনি প্রথম দিনেই ওই ছোট্ট তালাটা কিনে এনে সগৌরবে তার চাবিটা গেটের চাবির দড়ির ফাঁসের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়েছিলেন। তদবধি তাঁর হেফাজতেই ছিল চাবি দুটো, রাত্রে বালিশের তলায় ঢুকিয়ে রেখে দুর্গরক্ষীর মনোভাব নিয়ে শুয়ে পড়তেন।

গতকাল রাত্রে গেট বন্ধর পর শোবার সময় হঠাৎ অতর্কিত আক্রমণের মত নীপু এসে বলল, বাবা গেটের চাবিটা দেখি।

দেবীপদ অবাক হয়েছিলেন, এখন আবার কার বেরোবার দরকার হল?

এখন নয়, ভোরবেলা দরকার।

দেবীপদও তেমনি, অত বড় ছেলে বিবাহিত ছেলে। তার হাতে চাবিটা দিয়ে দেবে, তাতে আবার ইতঃস্তত করা কেন?

অথচ করলেন তাই।

চাবিটা বালিশের তলা থেকে বার না করে একটা প্রশ্নই বার করলেন ইতঃস্তত কণ্ঠ থেকে, কত ভোরে দরকার? আমার থেকে বেশী ভোরে কে উঠছে?

কী আশ্চর্য! একদিন মানুষেব দরকার হতে পারে না?

নীপুর গলার স্বরে গভীর অসন্তোষ, বাচন ভঙ্গীতে বিশেষ অসহিষ্ণুতা।

আরে বাবা, আমি তো শেষরাত্তিরেই উঠি, উঠে বাথরুম সেরে

তবে গেট খুলে দিই, তখনো তো সবাই স্বপ্ন দেখছিস। তোর মা হাই তোলে। বলিসতো উঠেই নেমে গিয়ে—

হঠাৎ নীহারকণা কর্তার বালিশেয় তলায় হাত চালিয়ে চাবিটা নিয়ে ছেলের হাতে দিয়ে বলে উঠেছিলেন, নিয়ে যা তো তুই। চাবিটা দরকার চাইছে, এত সাত সতেরো কথা কইছ কেন বলত ?

ছেলে চলে গেলে দরজায় খিল লাগিয়ে (যেটাই নাকি নীহার-কণার এই দোতলা হবার পর পরম পাওয়া।) বিছানায় বসে রুষ্টস্বরে বললেন, তোমার কি আর কোন কালে আক্কেল বুদ্ধি হবে না ? অতবড় ছেলে, তার সঙ্গে তুচ্ছ একটা চাবি নিয়ে জেরা করতে বসলে ?

দেবীপদও কম রুষ্ট নয়, এই ঘরভেদী বিভীষণই তো কেমন করে যেন ক্রমশঃই দেবীপদর কর্তৃত্ব খর্ব করে চলেছেন।

বরাবরই তো ছেলে মেয়েদের ন্যায় অন্যায় চোখে পড়লে বলেছেন মেয়েদের ধিঙ্গীপনায় শাসন করেছেন, নীহারকণা জানেন না ? কিন্তু এখন যেন নীহাবকণা নতুন হচ্ছেন, অনবরতই দেবীপদকে তলে তলে শাসাচ্ছেন, সবসময় অত বকবক কর কেন ? ওদের ফী কথায় নাক গলাতে যাও কেন ? ওরা যা পছন্দ করে না, তা করতে বস কেন। ওরা বড় হয়েছে ভাবো না ?

ওরা যড় হয়েছে !

ওঃ। বাপের থেকেও বড় হয়ে গেছে ?

ওরা বাপের নাকের সামনে তাঁর অপছন্দকর কাজ করে চলবে। আর দেবীপদ ভাবতে বসবেন, ওরা কোনটা পছন্দ করে আর কোনটা করে না এবং সেই বুঝে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করবেন ? ওরা দেবীপদর প্রতিটি ব্যাপারে নাক গলাতে আসে না ? দিব্য মুখের ওপর বলে না, এটা তোমার মোটেই .উচিত হয়নি বাবা' ······আচ্ছা ওর সঙ্গে তোমার এত গায়ে পড়ে কথা বলার কী দরকার ছিল ?

এখনো দেশের পুরুতকে মাসে মাসে মাসোহারা পাঠানো চালিয়ে যাচ্ছো? চিরকাল চালিয়ে যেতে হবে?

তিনি তো দেখছি অমর বরপ্রাপ্ত। পেনসনের পর তোমার বলে দেওয়া উচিত ছিল।

মানে 'আর পারা যাবে না' বলে দেওয়া। এই তো?

নিজের পেনসন থেকে আটটা করে টাকা দেবীপদর কাউকে দেবার অধিকার নেই? সেখানে ওরা নিজেদের অধিকার লঙ্ঘন করে অনায়াসে নাক গলাতে আসতে পারে?

কৈফিয়ৎ দিতে হবে দেবীপদকে। পুরুত ঠাকুরের ছেলে তাঁর বাল্যবন্ধু ছিল, অকালে মারা গেল। সেই থেকে দিয়ে এসেছেন, হঠাৎ ছেড়ে দেন কী করে? বুড়ো মানুষটা না হয় বেঁচেই আছে দীর্ঘকাল, দুঃখের প্রাণ আর চাঁদার ভাত বলেই আছে; তবু নব্বুইয়ের দরজার কাছ বরাবর তো এসে গেছে, আর কতকাল বাঁচবে?

বুলি আবার মণি অর্ডারের রসিদটা ফিরে আসা দেখতে পেলে হেসে গড়িয়ে পড়ে বলে, আমরা তো তোমার গ্রাম দেখিনি বাবা, শ্রীজীবনকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের 'জীবদ্দশা শতবার্ষিকী'র একখানা উৎসব করে চলো, আমাদের নিয়ে চলো।

এই একটা ব্যাপারেই যা নীহারকণা দেবীপদর পক্ষ সমর্থন করেন, বলেন, ওইটা নিয়েই বা তোদের এত মাথা ব্যথা কেন বাবু, প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু সেণ্টিমেণ্ট থাকতে পারে।

মাত্র ওই একটাই। নচেৎ সব সময় বিরোধী পক্ষের সমর্থক। কখনো বা সে পক্ষের নেতাও।

দেবীপদ এখন নীহারকণার রুষ্ট প্রশ্নে রুষ্ট জবাব দিলেন। (এই একটি মাত্র জায়গাতেই তো এই স্বাধীনতাটুকু আছে।)

বললেন, হঠাৎ কী দরকার পড়ল সেটা জিজ্ঞেস করলেও মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল?

ওরা অত জিজ্ঞেসাবাদ ভালবাসে না।

ওঃ। ভালোবাসেনা। তবে তো ভয়ে পিঁপড়ের গর্তে লুকোতে হবে। ওরই বা বলতে কী হয়েছিল? আর এত অসহিষ্ণুতাই বা কিসের?

চেঁচিও না বাবু! বলতে গেলে একশো কথা কইতে হয়। নীচের তলার সমরবাবুর বেকার ছোট ভাইটার কোথায় যেন একটা ট্রেনিঙের ব্যবস্থা হয়েছে। ছটায় ট্রেন ধরতে হবে। এখান থেকে হাওড়া। বোঝো। পাঁচটার আগে বেরোতে হবে, তাই সমরবাবু চাবিটা চেয়ে রাখছিলেন। লোকটা সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে আছে, আর তুমি জেরা করতে বসলে! অসহিষ্ণুতা হতেই পারে।

ওঃ সমরবাবু। বাপের ঠাকুর চোদ্দপুরুষ। ওর সঙ্গে লেটার বাক্সের চাবিটাও চলে গেল। কাল সক্কালেই যেন নিয়ে আসা হয়।

শুয়ে পড়েছিলেন দেবীপদ, এবং বেশ কিছুক্ষণ ভাড়াটে সমরবাবু সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করে তবে ঘুমিয়েছিলেন।

ভোরবেলা এটা বিস্মৃত হয়েই বালিশের তলা হাতড়েছিলেন। দেবীপদর মনে পড়ে গিয়ে রাগে অপমানে দুঃখে চোখে জল প্রায় এসে গেল। এই জলটা চিরসঙ্গিনীর বিশ্বাসঘাতকতায়।

ফস্ করে চাবিটা হাতিয়ে নিয়ে ছেলের হাতে তুলে দেওয়া হল? দেবীপদর মান সম্মানের প্রশ্নটা একবার মনে এল না?

বলা হল, 'তুচ্ছ একটা চাবির জন্য'—

এই বলাটার সঙ্গে সঙ্গে যেন দেবীপদর তুচ্ছতাটাও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হল।

আচ্ছা, আমিও নাবছি এক্ষুনি, তোমার সাধের সমরবাবুর কাছ থেকে চাবি উদ্ধার করে আনছি।

সমরবাবু লোকটি অতি ভদ্র, শান্ত, সভ্য, বয়সেও দেবীপদর থেকে অনেক ছোট। ওদের বাড়ির লোকেরাও সকলেই ভাল, সকলে মানে সমরের স্ত্রী মণীষা, বছর বারোর মেয়ে অসীমা, আর ওই বেকার

ছোট ভাই, ভ্রমর, সেও যথেষ্ট সৎ ছেলে। দেবীপদর কনিষ্ঠ পুত্র দীপুর মত আকাশে পা দিয়ে হাঁটে না। দীপুর সিগারেটের গন্ধ অনেক ইটকাঠ পেরিয়ে দেবীপদর দোতলার ঘরে এসে ঢোকে। দীপুর সিগারেটের ছাই বাতাসে ছড়িয়ে দালানের মেজেটাকে পর্যন্ত ভস্মাচ্ছাদিত করে রাখে। দীপুর লম্বা চওড়া কথায় গায়ে বিষ ছড়ায়।

অথচ ওদের ওই ভ্রমর দীপুরই বয়সী প্রায়, কী আপ্রাণ করে বেড়িয়েছে 'কিছু একটার' চেষ্টায়। এতোদিনে কিছু একটা জোগার করে ফেলল ও। তবু দেবীপদর ওদের ওপর বিষম বিরক্তি।

বেটা ছেলের নাম আবার ভ্রমর। বাপের কালে শুনিনি। অসহ্য।

নামটা নিয়ে তোমারই বা এত অসহ্য কিসের?

বলেন নীহারকণা, মিলের খাতিরে কত কী বিদঘুটে নাম রেখে বসে থাকে ছেলে-মেয়েদের। এই তো তোমার দিদির নাতনীদের নামগুলোই দ্যাখোনা। নন্দিতা, বন্দিতা, শেষ পর্যন্ত কিনা স্পন্দিতা। মানেটা কী? এদেরও বড় ভাইয়ের নাম অমর, মেজর নাম সমর। অবশেষে শেষেরটি ভ্রমর। তো তোমার কি এল গেল—

কী এল গেল বোঝাবেন কী করে দেবীপদ?

আসলে তো তিনি বাড়িতে ওই ভাড়াটে রাখারই বিরোধী ছিলেন।

বাড়ির জায়গা সংকুলানটাই তো ছিল সমস্যা, যদি বা সে সমস্যার সমাধান হয়েছে, তবে বহু কষ্টেই। এখনকার দিনে তো আগেকার মত কেবলমাত্র আস্থাভাজন দু'একজন রাজমিস্ত্রী আর কিছু ভাল জোগাড়ে জোগাড় করে নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বাড়ি করা নয়, যেমন হয়েছিল একতলাটার সময়।

তখন দেবীপদর মা বেঁচে ছিলেন, এবং তিনিই দাঁড়িয়ে থেকে

মিস্ত্রী খাটিয়ে একতলাটা সমাধা করিয়েছিলেন। জবরদস্ত মহিলা, মিস্ত্রীদের এতটুকু কাজে ফাঁকি দেবার জো ছিল না, বকে ভুত ভাগিয়ে দিতেন। আহা কোথায় সেই সব লোক, যারা দোষ করলে ঘাট মানতো, বকুনি খেলে ঘাড় গুঁজে চুপ করে থাকত! আর —'বুড়ো' বলে অছেন্দা করতো না।

এখন কন্ট্রাক্টরের হাতে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। সময়ের অভাব, এবং অল্পে সন্তুষ্টির অভাব। যে ধরণের মাল-মশলা এবং যে প্যাটার্নের আনুষঙ্গিক দিয়ে একতলা হয়েছিল, সে রকম হওয়াবার কথা এখন কী আর ভাবাই যায়?

ছেলেমেয়েদের সৌখিন বায়না মেটাতে দেবীপদর শেষ টাকাটি পর্যন্ত নিঃশেষ হয়ে গেছে। অথচ এতোটা শখ না করলে অনেকগুলো টাকাই বাঁচতো।

সে যাক, যতদিন বাঁচবেন পেনসনটা কেউ কেড়ে নিতে পারবে না, এই যা ভরসা।

ভাড়াটের কথা তুলেছিল বড় ছেলে।

বাড়ির ট্যাক্স ফ্যাক্স বেড়ে গেছে, ইলেকট্রিক বিলও বেড়েই চলেছে, একতলার ঘর দুটোয় একটা টেনান্ট বসাতে পারলে, অনেকটা সুবিধে হয়।

বাড়ির মধ্যে ভাড়াটে বসানো?

দেবীপদ মাথা নাড়লেন না, না, সে বড় ঝামেলা। তাছাড়া দোতলায় তো আর রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, খাবারের ঘরের ব্যবস্থা হয়নি।

আহা সেগুলো তো যাচ্ছেনা, দালানের মাঝখানে একটা পার্টিশান তুলে দিতে পারলেই তো ওদিকটা একেবারে সেপারেট। ওদিকের বাথরুমও পেয়ে যাচ্ছে তারা। তোমার ঘরটার মধ্য থেকে একটা দরজাও তো আছে পাশের প্যাসেজে পড়বার, সেটাই ওদের এনট্রেনস্ হতে পারবে। অসুবিধে কোথায়?

অসুবিধে এই, প্রাইভেসি বলে কিছু থাকবে না, তোমার হাঁড়ির খবর তাদের নখদর্পণে চলে যাবে।

তা' হলে তো কলকাতা শহরে ফ্ল্যাট বাড়িগুলোর—হুঃ। নিজেরা একটু সভ্য ভাবে থাকলেই হল।

ভাড়াটে একবার ঢুকলে কি আর জীবনে বেরোবে? দীপুটারও তো বিয়ে-টিয়ে হবে? সে সমস্যাই থেকে যাচ্ছে।

নীপু এত কথা কখনো বলে না। অধিক কথায় তার ঘৃণা, কিন্তু তখন নীপু 'মন্ত্রের সাধন জীবন পাতন' সংকল্পে নেমেছিল এক অদৃশ্য হস্তের অঙ্গুলিহেলনে।

অতএব ঠোঁট কামড়ে বলেছিল, দীপুর বৌ এলে কি ওই নীচের তলার ঘরে থাকবে?

তা' কেন? আমরাই পুবের ঘরটা ছেড়ে দিয়ে, বুড়ো-বুড়ি নীচের তলায় আড্ডা গাড়ব। এমনিতেই হয়তো কিছুদিন পরেই আড্ডা গাড়তে হবে। তোমার মার হাঁটুর যা অবস্থা। আমারও ক্রমশঃ···সিঁড়ি ভাঙ্গাতো ক্রমেই—

নীপু আবার ঠোঁট কামড়ে একটু ব্যঙ্গ হাসি হেসে বলেছিল, বুলি টুলি অবশ্যই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে থাকবে না?

কী বললে? মানে—

মানে বলছি, আশা করা যায় বুলি টুলির ততদিনে বিয়ে হয়ে যাবে। তোমরা ওদের ঘরটাতেই—

আহা, বিয়ে হলেই তো সব মিটে গেল না? ওরা আসবে-যাবে না?

এই তর্ক বিতর্কটা হচ্ছিল নীচের তলাতেই। কারণ পার্টিশানটা কোথায় তোলা যাবে, সেটা বোঝাবার তালেই নীপু বাবাকে এখানেই কব্জা করে ফেলেছিল।

দেবীপদ তখন বাজার থেকে ফিরে থলি থেকে 'বাজার' বের করে করে ভাঁড়ার ঘরের সামনে নামাচ্ছিলেন।

রান্নাঘর-ভাঁড়ার ঘর, বাইরের ওই ছোট ঘরটা। খাবার দালান এবং দুটো ভাল শোবার ঘর। এই হচ্ছে বাড়ীর চৌহদ্দি। ঠাকুর এ যাবৎ ভাঁড়ারের কোণেই বাস করে এসেছেন। আর ঘর দুটোর বড়টায় দেবীপদ এবং ছোটটায় মেয়েরা। অতঃপর বিয়ের পর নীপু। তখন সে ঘরদুটোয় তো ফালতু মালে বোঝাই। কারণ পুরনো সেইসব ডেয়োঢাকনা দোতলার নতুন ঘরে মানায় না।

নীপুর জোর যুক্তি, যে যুগে লোকে একটু রোয়াক ঘিরে দোকান ঘর বানিয়ে দিয়ে টাকা তুলছে, সেই যুগে দু'দুখানা ঘর, মার স্নানের ঘর, জল কলের ব্যবস্থাসহ ফালতু মালে বোঝাই করে ফালতু ফেলে রাখা স্রেফ পাগলের কাজ।

এই যুক্তিতে যখন দেবীপদ কিছুটা ঘায়েল, দীপু নিজেব ঘব থেকে বেরিয়ে এসে (সে তার একতলার বহির্মুখী ঘরটি ছাড়েনি।) সরবে এবং অভ্যস্ত অবহেলার ভঙ্গীতে বলে উঠল, দীপুর জন্য কারো কিছু চিন্তার দরকার নেই। দীপুকে যতক্ষণ বাপের হোটেলে থাকতে বাধ্য হতে হবে থাকবে। যখন সেই দুঃসময় গত হবে নিজের পথ দেখবে, ব্যাস। দীপু ব্যাটার এই ক্লীয়ার কথা।

নেহাৎ বাবার সামনে, তাই দীপু শালা বলেনি।

এতখানি ক্লীয়ার কথার পর, আর কোনো কথা ?

অতএব পার্টিশান উঠল।

কিন্তু ভাড়াটে এসে ঢোকার পর দেবীপদর মনে হল, সমস্ত ব্যাপারটা ষড়যন্ত্র। ভাড়াটে হয়ে আসার পর প্রকাশ পেয়েছে সমর-বাবু নীপুর বো শ্রেয়ার পুরনো মাষ্টারমশাই, শ্রেয়ার বিশেষ ভক্তিভাজন।

এটা কী বিশ্বাসযোগ্য কথা ?

শ্রেয়াই যে বরকে জপিয়ে জপিয়ে ভেসে বেড়ানো সময় লাহিড়ীকে ঠাঁই দিয়েই গুরুঋণ শোধ করেছে তাতে আর সন্দেহ কী?

বাবা বুড়ো হতে পারে। বাবা বোকা নয়।

আর তোরা ভাবিস লোকটা রিটায়ার করেছে। অতএব বুড়ো ছাড়া আর কী? অতএব ধাপ্পা দিয়ে যা হোক বোঝালেই হল?

এই বিরুদ্ধ চিত্তের ছায়ায় ভদ্র সভ্য সমর লাহিড়ীও দেবীপদ ঘোষালের চোখে 'পাজী', 'ঘোড়েল' 'মিচকে ঘুঘু।'

বিশেষণগুলো অবশ্য দেবীপদ উচ্চারণ করতে সাহস করেন না। হয়তো বা লজ্জাও পান। কিন্তু মনে যখন-তখনই উচ্চারণ করেন। অকারণেই করেন।

আজ সকালেও মনে মনে বললেন, রোস ব্যাটা মিচকে, তোর চালাকি বার করছি। রাত দুপুরে মোক্ষম সময়ে অকস্মাৎ 'চোরা' আক্রমণ! কেন, সময়ে এসে আমায় বলতে পারিসনি 'দাদা, চাবিটা কাল একটু সকাল করে খুলে দেবেন, ভ্রমর বেরোবে।'

তা নয়, কোন কালের প্রাক্তন ছাত্রী, তাকে জপিয়ে তার ভ্যাবা-কালা বরকে লেলিয়ে দিয়ে—ঘোড়েল ঘুঘু! আচ্ছা আমিও দেখাচ্ছি।

প্রথমে ভেবেছিলেন নিজেই গিয়ে বলবেন, কী হল সমরবাবু চাবিটা কই দিলেন না? কিন্তু পরে ভয় ভয় করল, বৌমা যদি গুরুর অপমানে আহত হয়ে বলে বসে, আপনি ওভাবে তেড়ে না গিয়ে আমায় বললেন না কেন?

ব্যাস তারপরই তো কাঠগড়া।

একে একে জনে জনে।

নীহারকণা তো যা তা করবেনই, টুলিও ছাড়বে না, সকলেরই

যেন ওদিকে ঢল। তাছাড়া শ্রীমান নীপুবাবু? বাবাকে কী পরিমান ধিক্কার বাণীতে বিদ্ধ করবেন বলা শক্ত। এমন কি দীপু-বাবুও রাজাই ভঙ্গীতে এসে বলে উঠতে পারেন, ফাদারের এটা খুব খারাপ কাজ হয়েছে।

দেবীপদ তাই ছেলেকেই বললেন।

যখন খেতে বসতে যাচ্ছে, যেন হঠাৎ মনে পড়ার ভঙ্গীতে বলে উঠলেন, হ্যাঁ, ভাল কথা, নীপু তোমাদের সমববাবুতো কই চাবিটা দিয়ে গেল না!

নীপু গলার স্বর নামিয়ে অবলীলায় উত্তর দিল, দিয়ে দিতে এসেছিলেন। আমিই বারণ করলাম, রোজই যখন দরকার। আর ভ্রমর ফিরবেও তো রাত সাড়ে দশটার আগে নয়, ট্রেন লেট হলে তো কথাই নেই। গেটের চাবি আমাদের কাছে থাকার কোনো মানে হয় না।

শুনে দেবীপদর পা থেকে মাথা অবধি একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ বহে গেল।

'আমিই বারণ করলাম।'

ওঃ! তুমিই সব। তুমিই কর্তা!

এই বাবা ব্যাটা সংসারের কেউ নয়? বৌয়ের আঙুলের ডগায় উঠছিস বসছিস বুঝিনা আমি? এ সমস্তই ষড়যন্ত্র, পরিকল্পনা। আগে থেকে প্ল্যান করা!

ইচ্ছে হল সামনের ওই খাবার টেবিলটাতেই একটা প্রচণ্ড ঘুষি বসিয়ে বলে ওঠেন, কেন? কেন? বলে দিলে কেন? তুমি বলে দেবার কে? আমি মরে গেছি?

কিন্তু বলা সম্ভব নয়, পার্টিশানের ওপারেই ওরা।

দেবীপদকেও চাপা গলায় বলতে হল, একেবারে বলে দিলে? বাড়ির চাবিটা অন্যের কাছে থাকবে?

নীপু চেয়ারটা টেনে নিয়ে গুছিয়ে বসে বলল। তুচ্ছ একটা

ব্যাপার নিয়ে উত্তেজিত হচ্ছ কেন বলতো? গেটের ঐ বাজে একটা তালার চাবিটা কী এমন দামী হল?

দেবীপদ অবাক।

তালাটা বাজে, তাই চাবিটা কিছুনা? চাবিটা একটা 'অধি-কারের প্রতীক' নয়? বাড়ির মালিক জানতে পারবে না বাড়ির গেটটা কখন বন্ধ হবে, কখন খুলবে?

আবার এমন দুঃখে অপমানে চোখে জল এসে গেল দেবীপদর।

কষ্টে বললেন, ওর তো একটা ডুপ্লিকেট ছিল, সেটা দিলেও পারতে।

যদিও পুরনো তালার চাবির ডুপ্লিকেটের অস্তিত্ব কোন গেরস্থ বাড়িতে থাকে কিনা, অথবা খুঁজলে খুঁজে পাওয়া যায় কিনা, সেটা গবেষণাসাপেক্ষ। তবুও বললেন এই বোকার মত কথাটা।

আর সঙ্গে সঙ্গেই ছেলের কাছ থেকে জবাব এল, তাহলে সেটাই বরং তোমার কাছে রেখো। ব্যাপারটাতো একই।

টেবিলে খেলেও এ বাড়িতে এখনো থালায় ভাত বেড়ে দেওয়ার প্যাটার্নটা বিদায় নেয়নি। নীহারকণা ছেলের ভাতটা বেড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি মাছটা ভেজে নিয়ে আসতে আসতেই কথার শেষাংশটুকু শুনতে পেলেন, এবং মুহূর্তে সবটা বুঝে ফেললেন। তবু গরম পার্শে মাছ ভাজা দুটো ছেলের পাতে দিয়ে, বাঁ হাতে পাখার স্পীড্‌টা বাড়িয়ে দিয়ে সরল গলায় বললেন, কিসের ব্যাপার নীপু?

নীপু বলল, কিছু না, এমনি।

রাগে মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল, দেবীপদর গলাটা যেন বন্ধ হয়ে এল। কষ্টে বললেন, একেবারে 'কিছুনা' বলা যায় না। ব্যবস্থা হয়েছে গেটের চাবি এখন সমর বাবুর কাছে থাকবে।

নীহারকণা ছেলের মতই অনায়াসে বললেন, তা ওনার ভাইয়ের যেমন কাজ হল, ও ছাড়া উপায় কী? ভোরে না হয় তুমি ওঠো, খুব

ভোরেই ওঠো, কিন্তু রাত্তিরে? গেটে তালা দিতে কি বারোটা পর্যন্ত জেগে বসে থাকবে তুমি?

তার মানে সবাই ষড়যন্ত্রের মধ্যে।

দেবীপদ গৃহিণীর দিকে ব্রহ্মতেজের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে উঠলেন, বাঃ! বেশ ভাল ব্যবস্থাই হয়েছে। তা লেটার বক্সের চাবিটাও ওর কাছে থাকলেই বোধ হয় সুবিধে?

ও হো হো।

নীপু হঠাৎ মনে করার ভঙ্গীতে বলল, সেটা তো উনি কাল রাত্রেই দড়ি থেকে খুলে—

অকারণ একবার কোমর তুলে কেৎরে বসে বাঁ হাতটা প্যাণ্টের পকেটে ঢোকাল, অতঃপর বলল, না; তখন পায়জামা পরা ছিল। শ্রেয়ার কাছে দিয়েছি বোধহয়।

নীহারকণা এখন একটু থতমত খেলেন, স্বামীর মুখের দিকে আড়ে তাকিয়ে দোমনা ভাবে বলে উঠলেন, ও চাবিটা আবার এদিক ওদিক করা কেন? ইনিই খোলেন টোলেন।

উঃ! কাল থেকে তুচ্ছ একটা চাবি নিয়ে এত চলছে—

নীপু শব্দ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে বলল, নিয়ে নিও শ্রেয়ার কাছ থেকে।

'দিয়ে যাব' নয় 'নিয়ে নিও।'

কে নিয়ে নেবে?

দীপু পার্টিশানের এপারে চলে এসে বেকার পড়ে থাকা ইজি চেয়ারটার উপর বসে পড়ে বলে উঠল, মাষ্টার বৌদি, চায়ের পাট উঠে গেছে?

সমরের বৌ মনীষা একগাল হেসে এগিয়ে এসে বলল, আপনার

আর বোধবুদ্ধি হল না। রোজ বলি না আপনাদের বাবাকে আমরা 'দাদা' বলি, আপনি কি হিসেবে আমায় বৌদি বলেন?

হুঃ। বোধবুদ্ধি ক'জনেরই বা থাকে? থাকলে, আপনি কি আমায় 'আপনি আজ্ঞে' চালিয়ে যেতেন?

ও হ্যাঁ হ্যাঁ। সেদিন কথা হয়েছিল বটে। আচ্ছা বাবা তুমি। তুমি। তবে তোমাকেও যথাবিহিত ডাকে ডাকতে হবে।

/সেই বিহিতটা কি?

কেন কাকীমা।

কী কাকীমা! মাথা খারাপ! তাহলে তো সমরদাকে কাকু ডাকতে হবে। হো হো হো। নিন নিন বাকতাল্লা রেখে চা ছাড়ুন।

বাড়িটা দেবীপদরই।

দেবীপদ কি স্বপ্নেও ভেবেছেন, তাঁর ঘরের মধ্যেই ইঁদুরে মাটি কেটে গহ্বর করছে।

শুধু চা বলে তো কোনো কথা নেই, মনীষার কাছে তো নয়ই। পুরো পরিবারটাই ভদ্র। চায়ের সঙ্গে টা-টা, বেশ মনোরম, মার্জিত।

আপনার কাছে চা খেতে আসার উদ্দেশ্য কী জানেন তো বৌদি?

মনীষা হাসি মুখে বলে, জানি। বৌদির হাতের চা অপূর্ব অনবদ্য বলে।

হ্যাঁ সেটাও একটা কারণ বটে, প্রধানই কারণ। দোতলার বৌদির যা একখানা হাত! আহা। তা ছাড়াও—ফাদারের চোখের আড়ালে দু'এক কাপ বাড়তি খেয়ে নেওয়া, এই আর কি। ধরুন বরাদ্দ পাওনার পর ওপরের বৌদির কাছে কোনো এক সময় এক কাপ নিমের পাঁচন খেয়ে নেওয়া গেল, কোনো এক সময় মাতৃদেবীর স্নেহহস্তের দুধ চিনির শরবৎ খাওয়া গেল, 'ঝাঁসির রাণী' আর 'যোয়ান অফ আর্ক'কে' তোয়াজ টোয়াজ করে দু'বারে দুকাপ, এবং আপনার কাছে যে কবার ঢুকে পড়া যায়।

দীপু হাসল, আসলে কি জানেন, চায়ের দোকানে আজকাল হেভী দাম ধরে। এদিকে পকেট ধু-ধু মরুভুমি। এইভাবে টায়ে-টোয়ে ভবিষ্যতের আশায় বেঁচে থাকা। শ্রীযুক্ত ভ্রমর নমস্য ছেলে। আমার দ্বারা ভোরে উঠে সাড়ে পাঁচটায় ট্রেন ধরা? বরং ট্রেনের লাইনে গলা দেব।

মাথা কাটা যাবার মতই অবস্থা, তবু স্বামীর ভারী থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে নীহারকণা টুলিকে ডেকে বললেন, এই দ্যাখ তো বৌদির ঘরে, লেটার বক্সের চাবিটা নীপু কোথায় রেখে গেছে। জিগ্যেস করে নে বৌদিকে।

টুলি সম্প্রতি মাধ্যমিক দিয়েছে, এখন ওর অখণ্ড অবসর, কাজেই তার চেতনার জগৎ এখন বাঘা বাঘা সব গোয়েন্দার দ্বারা আচ্ছন্ন। বই হাতে নিয়েই খায়, বইয়ের পাহাড় বিছানায় জমিয়ে শোয়, এবং সাধারণ সাংসারিক কথা চট করে মাথায় ঢোকাতে পারে না।

মায়ের ডাকে অতি বিরক্ত হয়ে বইটা পড়তে পড়তেই চলে এসেছে। বলল, আবার সেই চাবি চাবি? ভ্রমরদার ট্রেনিং-এ যাবার টাইমটা জানোনা বুঝি?

বই রাখতো! কান দিয়ে শোন। এক দড়িতেই লেটার বক্সের চাবিটা বাঁধা ছিল। নীপুতো বলল, ওরা দিয়ে গেছে।

তদ্দণ্ডেই তোমার বধূমাতার রিঙে ঢুকে গেছে।

বলেই টুলি তদ্দণ্ডেই আবার বইতে চোখ ফেলেছে।

নীহারকণা শঙ্কিত হলেন।

ওঁরও হঠাৎ দেবীপদর মত মনে হল সবটাই পরিকল্পিত নয়তো?

নিজেকে অপরাধী অপরাধী ভেবে একটু অস্বস্তিও হচ্ছে। রাত্রে

ফস্‌ করে ছেলের হাতে দিয়ে দিলেন চাবিটা, ছোটটা খুলে নেওয়া উচিত ছিল।

আবার আত্মপক্ষ সমর্থনও করলেন, তা আমিই বা কী করে জানব বাবা চাবিটা ওদের কাছে রাখার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তবে কথা হচ্ছে জিনিসটাই বা কি এমন হাতী ঘোড়া? লোহার সিন্দুকের চাবি নয়, ভাঁড়ারের চাবি নয়, লেটার বাক্সের পটপটে একটা তালার টিনের মত ক্ষুদে চাবি। এর জন্যে আবার এত কী?

থাকে তো থাকুকই না শ্রেয়ার কাছে। ওর হয়তো সাধ হয়েছে, নিজের হাতে চাবিটা খুলে চিঠিপত্র বার করবে। ওর বাপের বাড়ী থেকেই তো চিঠি আসে বেশী। তাছাড়া বাড়তি নীচের তলায় নামতে হবে না এখন আর, মনীষাদির কাছ থেকে বোনার প্যাটার্ন শিখতে তো হরদমই যাচ্ছে।

কিন্তু ওই এক অবুঝ মানুষ।

ওঁকে নিয়েই নীহারকণার জ্বালা। কত যে সামলে বেড়াতে হয়। বয়েস হলে যে দাবীর মুঠো আলগা করতে হয়, এ জ্ঞান নেই। চিঠিগুলো নিয়ে আগে নিজে দেখবেন, কে কোথা থেকে কাকে লিখেছে, তারপর পোষ্টকার্ডগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে নেবেন, তবে যার যার চিঠি দিয়ে দেবেন। বুলি টুলির নামে একখানা পত্রিকা আসে। আমিই করিয়ে দিয়েছি, নিত্যই বলবেন, বরাবরতো নীহারকণা। দেবীর নামে ম্যাগাজিন ট্যাগাজিন এসেছে, হঠাৎ ওদের নামে কেন?

নীহারকণা শ্যাম-কুল দুই রাখেন, বলেন ওরাই তো আগে পড়ে। আমার সময় হতে হতে ওদের চিবোনো হয়ে যায়।

মনে মনে হেসেছেন, কী এসে যায় ওই নামের দাবিটুকু ছাড়ায়?

কিন্তু দেবীপদ এতে উত্তেজিত হন। নইলে সকাল থেকে ওই চাবিহারা হয়ে এমন একখানা মুখ করে বেড়াচ্ছেন, যেন কী অগাধ একটা সাম্রাজ্যই হাতছাড়া হয়ে গেছে।

আচ্ছা সাম্রাজ্যই যদি নয় তো শ্রেয়া নামের মেয়েটা সেটাকে নিয়ে এমন বিচ্ছিরীপনা করল কেন?

স্বামীর মন মেজাজকে সমে আনতে, নীরহারকণা তো লজ্জার মাথা খেয়ে বৌয়ের কাছে গিয়ে, যথারীতি কর্তাকে 'এলেবেলে' করে দিয়ে বলেছিলেন, অ শ্রেয়া, তোমার শ্বশুরের সেই রত্ন ভাণ্ডারের চাবিটি কোথায় গো? তার জন্যে যে হন্যে হয়ে খুঁজছেন। বলছি নীপুর ঘরেই আছে—

শ্রেয়া একটা বোধহয় ভুল হয়ে যাওয়া বোনার প্যাটার্ন খুলে খুলে পশমটা গোলা করছিল, তদ্দণ্ডে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল, গোলাটা কোল থেকে গড়িয়ে পড়ে অনেকখানি পশমের খেই খুলতে খুলতে এগোতে থাকল।

শ্রেয়া বিপন্ন মুখে বলল, এক্ষুণি চাই?

নীহারকণা লজ্জিত হলেন।

তাড়াতাড়ি বললেন, না না, এক্ষুণি কি হবে? এখনো তো ডাকের সময় হয়ইনি। দিয়ে রেখো পরে।

আচ্ছা! শ্রেয়া নিশ্চিন্ত হয়ে পশমের গোলা গোটাতে বসল।

সেই 'পর'টা আর এল না।

সেইদিন—একদিন, দুদিন, পাঁচদিন।

দেবীপদ নামক ব্যক্তিটি চিড়িয়াখানার বাঘের ভূমিকায় চাপা গর্জন করে বলেন, আচ্ছা নীপু এলে আমিই বলছি।

নীহারকণার চাপা গর্জন, দোহাই তোমার, আর মুখ হাসিও না। ছেড়ে দাও। বুঝেছ তো?

বুঝেছি। এবং তোমার নির্বুদ্ধিতাও বুঝেছি। তুমি শাশুড়ি। তুমি একটা পুঁচকে বৌকে টিট্ করতে পারলে না।······

বিয়ের আগে বি এ পাশ করে এসে যে মেয়ে চার চারটে বছর পার করে ফেলল, তাকে যদি 'পুঁচকে' বলা হয়, তাহলে বক্তার মাথার সুস্থতা সম্পর্কে সন্দেহ করতে হয়।

কিন্তু সে সন্দেহ প্রকাশ করার দিকে গেলেন না নীহারকণা, তাচ্ছিল্যের গলায় বললেন, নিজের ছেলে মেয়েকেই বড় টিট্ করতে পারা যায় তো অন্যবাড়ি থেকে আসাকে। যাদের পেট থেকে ফেললাম, তিলতিল করে গড়ে তুললাম, তারা সবাই আমার মনের অনুযায়ী?

দেবীপদ কড়া গলায় বললেন, তাহলেও তারা কেউ কুচুটে ফন্দিবাজ নয়।

তুমি তো নিজেই বল, বাড়িতে ভাড়াটে বসানোটা তোমার বড় ছেলের একটা কুটিল ফন্দি।

নীহারকণার তর্কে দেবীপদ উষ্ণতর হলেন। বললেন, সেটা সঙ্গদোষ।

যাকগে তোমারই বা ওই তুচ্ছ অধিকারের লড়াইয়ে নেমে কী পরমার্থ হবে শুনি?

মেরুদণ্ডহীনেরা এই রকমই ভেবে সান্ত্বনা পায়।

বলে গট গট করে নেমে গেলেন দেবীপদ। বেরিয়ে গেলেন বাড়ি থেকে।

সদর দরজার পাশের দেওয়ালেই লেটার বক্সের বন্ধ দরজার তালাটা ঝুলছে দেখে বুকটা হু-হু করে উঠল দেবীপদর। খুলে দেখবার উপায় নেই।

অথচ দাঁড়িয়ে থেকে মিস্ত্রীকে দিয়ে তিনিই করিয়েছিলেন এটা।

নিজের হাতে চাবিটা খুলে যখন ভেতরের জিনিসগুলো বার করতেন, প্রাণটা কেমন ভরাট ভরাট লাগত। যেদিন আবার এটা ওটা-পত্র পত্রিকা আসত, সেদিন তো আরোই। দেবীপদর নিজের বলতে তো কিছুই আসেনা। কে বা চিঠি লিখছে। কী বা পত্র-পত্রিকার গ্রাহক হবেন।

দেবীপদ ঘোষালের নামাঙ্কিত যা আসে, তা হলো ইলেকট্রিক

বিল, ট্যাক্সের রসিদ, মাঝে মাঝে জীবনবীমা কোম্পানীর এক একটা হিসেব।

নীহারকণা যাতে ভবিষ্যতে বিধবা ফিধবা হয়ে কষ্ট না পায়, তাই কবে কী যেন করে রেখেছিলেন। এখনো তিনমাস অন্তর পঁয়তাল্লিশ টাকা করে দিয়ে চলেছেন।

মেজাজ ভাল থাকলে দেবীপদ হেসে হেসে নীহারকণাকে বলেন, এই দেখো কতকাল ধরে প্রিমিয়াম টেনে যাচ্ছি, তোমার আর বিধবা হবার নামটি নেই।

কিন্তু হাসি ঠাট্টার পাট ক্রমশঃ যেন উঠেই গেছে, কেবলই গুম হয়ে থাকার অথবা নীহারকণার সঙ্গে কথা কাটাকাটির চাষ।

রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে নিজের মনেই মনে মনে কথা কাটাকাটি করে চলেছেন দেবীপদ।

বলে কিনা কী পরমার্থ ?

চিঠিগুলো হাতে এলে আমি বাড়ির নাড়ীর গতি বুঝতে পারি না ? পোস্টকার্ডগুলো পড়ে নিয়ে জেনে ফেলতে পারি না সেইসব নামসমূহ যা আমার কাছে বলাই হয় না ?

টের পাইনা, আমার ছোট পুত্তুর কত খরচা করে নিয়মিত অ্যাপ্লিকেশন ঝেড়ে চলেছে। সবইতো রেজেস্ট্রী পোষ্টে, প্রমাণ পড়েই থাকে। হাঁটাহাঁটি ছুটোছুটি কাউকে গিয়ে ধরাধরি এসব বালাই তো নেই। ঘরে বসে বাপের পয়সা খরচা করে করে 'চেষ্টার নমুনা'। কাউকে ধরাধরি করতে পারেন না বাবু, তাতে নাকি মানের কানা খশে যায়। আগে আগে ক'বারই তো এক একটা খবর দিয়েছি। বাবু কড়া জবাব দিয়েছেন, 'নেভার'। ওসব ধরাধরি আমার দ্বারা হবে না। পৃথিবীতে তুমি কোন জিনিষটা ধরাধরি না

করে পাচ্ছ যাদু? ধরাধরির সঙ্গে আবার পয়সা গোঁজা। দেখিস বাপ মরলে চিতা জোগাড় করতেও ধরাধরি করতে হয় কিনা?

চুলোয় যাক। আর বলিনা।

দেখি কত সিগারেট ধ্বংসাতে পারিস, আর কত অ্যাপ্লিকেশন ছাড়তে পারিস।

কিন্তু—লেটার বক্সটা যদি হাতছাড়া হয়ে যায়, সবই তো আমার অজ্ঞাত থেকে যাবে। আর—আর—আমি কি তা'হলে টের পাবো আমার বিদ্যেবতী মেয়েরা কারো সঙ্গে 'পত্রবন্ধু' করে বসে প্রেমপত্র চালাচালি করছেন কিনা।

চুল নেই মাথা জোড়াই প্রায় টাক, তবু নিজের চুল নিজে ছিঁড়তে ইচ্ছা করছে দেবীপদর।

আচ্ছা, কবে থেকে 'সংসার' এমন অ-সভ্য হয়ে উঠেছে?

নীপুর বিয়ে থেকে?

উঁহু না তো।

তখন তো সেই একতলাটির মধ্যেই বৌয়ের কত গুণপনা দেখা। ছেলের কেমন 'চোর চোর' ভয় ভয় ভাব। যেমন আমাদের কালে ছিল। বাপ ধরে করে বিয়ে দিত, কিন্তু ছেলে বেটার চোর বনে যাওয়া হোতো। নচেৎ মহাপাতক। তো গোড়ার দিকে নীপুটা তো ছিল সেরকম।

তবে কখন থেকে?

আমার অফিস যাওয়া খতম হওয়া থেকে?……যেই দেখল, বাবা আর মটমটিয়ে ফর্সা জামা কাপড়, পালিশ করা জুতো পরে অফিস যাচ্ছে না, ধুতির কোঁচা খুলে পাট করে জড়িয়ে পরে গেঞ্জি গায়ে দিয়ে ঘুরছে, চার আনার ফোড়ন আনতেও দোকান ছুটছে, তেলের বোতল হাতে রাস্তায় বেরোচ্ছে! সেই থেকে?

তাই বা বলি কি করে?

ছোট পুত্তুর তো চিরকালই নবাবপুত্তুর, বড়ই তো ছোটবেলা

থেকে বাপ মায়ের সাহায্যকারী, সংসারে ভারসই। আমার হাত থেকে তেলের বোতল বাজারের থলি কেড়ে নিয়ে বলেছে 'তুমি এত সব করছ কেন? এতকাল খাটসে কিছুদিন বিশ্রাম কর' বসে।

তাহলে কি দোতলা তোলার পর থেকে?

ঠিক তাই। হুঁ ঠিক।

মোজাইকের মেঝেয় পা ফেলে, আর শাওয়ারের নীচে গা মাথা ফেলে মেজাজ বদলে গেল।······আর যার জন্য এত নবাবী, তাকেই অবজ্ঞা শুরু হল।

আশ্চর্য! কী অকৃতজ্ঞ পৃথিবী!

দেবীপদ যে কোন দিক লক্ষ্য করে হাঁটছেন নিজেই জানেন না। কখন যেন বাজার ছাড়িয়ে এসেছেন ঠিক নেই।·····ভাবতে ভাবতে মনে হল সোনায় সোহাগা হল বৌয়ের মনোরঞ্জন করতে, তার প্রাক্তন গুরুদেবকে বাড়িতে ভাড়াটে করে ঢুকিয়ে।

ঠিক তারপর থেকেই বাড়িতে আর কারো সারল্য নেই, ভাই-বোনে ভাব ঝগড়া, খুনসুড়ি নেই। সর্বদাই সকলের মুখের চেহারা ব্যাঙ্ক ফেল হয়ে গেছে।

তার মানে যত নষ্টের মূল ওই ভাড়াটেরা। ওরাই কুমন্ত্রণা দিয়ে দিয়ে বাড়ি সুদ্ধ সবাইকে যেন তুক করেছে। বড় তরফের কথা তো বাদই দিচ্ছি। মেয়ে দুটোর পর্যন্ত সমরদা ভ্রমরদা মনীষাদি বলতে বলতে মুখে নাল গড়ায়!

দু'খানা ঘরের জন্য তিনশো টাকা দিচ্ছেন তো মাথা কিনেছেন। এদিকে বসে বসে দেবীপদ ঘোষালের সংসার ভাঙছেন।

নিজের আয়নাতেই তো দেখাদেখি।

দেবীপদর আয়নায় ওই নিরীহ পরিবারটার এই রকমই ছায়া পড়ে।

অতএব তিনি একটি সংকল্পে দৃঢ় হন।······ওঃ বড়বাবু ওই তিনশো টাকা পাঠিয়ে দেওয়ার গরবে গরবিত। আর কেউ দেবেনা

তিনশো ? হুঃ ! বাজার দেখিননা ? আমিই দেখিয়ে দেবো পাঁচশো পেতে পারি কিনা !

অবশ্য সকলেরই নিজের আয়নায় দেখাদেখি।

দেবীপদর নিজের মেয়েরাইতো মনে মনে অভদ্র ভাবছে।... এতে যদি ভাবা যায় ভাড়াটেরা তুকতাক করছে, তো ভাবাই যায়। অন্ততঃ কেউ তো কাউকে বটেই।

ভস্ম টস্ম দিয়েও তো তুক-তাক হয়, পঞ্চশরের ভষ্ম তার মধ্যে সব চেয়ে জব্বর। আদি অন্তকাল ধরে চলেই চলেছে তার বশীকরণ শক্তি।

টুলি বয়েসে ছোট হলে কি হবে, দিদির থেকে অনেক চতুর। সেই চতুরতাতেই দিদির নাড়ি টিপে বুঝে ফেলেছে, দিদির কাছে এখন ভ্রমর প্রসঙ্গ অমৃত সমান। আর যে দিদি কদাচ তাকে পাত্তা দেয়না, নিজের উচ্চমানের বান্ধবীদের সঙ্গেই যত কথাবার্তা, সেই দিদিই উক্ত প্রসঙ্গের অবতারণা করলেই (অজ্ঞাতসারেই হয়তো) কেমন পাত্তা দিচ্ছে টুলিকে।

সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্রী বুলি এখন সবে মাধ্যমিক দেওয়া টুলিকে মানুষ বলে গণ্য করে ডেকে কথা বলছে। দেখেছিস টুলি, দাদার উত্তরোত্তর উন্নতি ?......হেড অফিস থেকে অর্ডার না পেলে দাদা আর আমাদের সঙ্গে প্রাণখুলে কথাই বলেনা। আগে কত মজা করে করে সহকর্মীদের বোকামী মুখ্যুমী ধূর্তামির কথা গল্প করত, এখন সব স্টপ ! স্রেফ ফ্রীজ হয়ে বসে থাকে।

আচ্ছা বলত টুলি মার এই সংসারের সব কাজ একা সামলে বেড়ানো ঠিক ?...কেন, বাড়ির বৌ কাজকর্ম করেনা ?...সেই যে গোড়ায় গোড়ায় নিখুঁত জ্যামিতিক গঠনে পরোটা বেলে তাক

লাগিয়ে দিয়েছিল, তার কী হল? স্রেফ্ তো সেই পুনর্মূষিক, মা জননীর হাতের 'গোল পরোটা'।—বসে বসে অত কে করে। শ্রীমতীকেও তো দেখছিস, কেমন নিশ্চিন্ত হয়ে উলের বল নিয়ে বসে থাকে।

'নামের সঙ্গে বুদ্ধিব মিল! ওটাই শ্রেয় মনে করে।' বলেই টুলি অতঃপর আসল প্রসঙ্গে আসে।

বাবার ওই 'চাবি চাবি' গর্জনটা ভাগ্যিস ভ্রমরদার কানে যায়নি, গেলে কি লজ্জা পেত বেচারী! উঃ, ওই ভোরে উঠে শুধু দুখানা টোস্ট খেয়ে বেরিয়ে যাওয়া, আর রাত দশটা এগারোটায় আসা, ভাবা যায়না। তার ওপর আবার কারখানার ট্রেনিং হাড় পেষাই।—মণিষাদিও দুঃখ করছিল, বলছিল, দুপুরের খাওয়াটাতো সেই কারখানার ক্যান্টিনে! যা খাওয়া!…মহিলাটি এতো ভালো! দ্যাওরকে কে এত ভালবাসে বল।…আমি তো বলি, বুধবার বুধবার তো ভ্রমরদার অফ্, সেইদিন সাতদিনের ভাল রান্নাগুলো রাঁধবেন মনীষাদি! আহা ভ্রমরদা সৌখিন রান্না টান্না খেতে এতো ভালবাসে। আমি বলি আজ আপনার সারাদিন ঘুমনো উচিত ভ্রমরদা। তা হাসে—বলে দিনের বেলা ঘুমতেই পারিনা।

চালিয়ে যায় আবোল তাবোল কথা।

দিদিকে তো জানানো হল ভ্রমরদার বুধবারে বুধবারে অফ্ডে, ভ্রমরদা ভাল রান্না খেতে ভালবাসে, ভ্রমরদা দুপুরে ঘুমোয় না!

বাবা বেশ মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছেন।

কথাটা বলল নীপু টাইটা বাঁধতে বাঁধতে, এ রকম সময় বোধহয় মানুষের গলাটা কেমন অসহায় অসহায়ই লাগে।

ঘরে শ্রেয়া ব্যতীত আর কেউ নেই, এবং ধরা যেতে পারে

দেওয়ালের কান নেই, কাজেই নীপ্ন কোনো জবাবের জন্যে একটু অপেক্ষা করল, জবাব এলনা।

স্বামীর মশলার কৌটোয় ভাজা মশলা ভরে দেওয়াটাও তো কম জরুরি নয়।

নীপ্ন আবার কথা বলল, অন্য লাইনে।

বলল, বয়স হলে মানুষ এত অবুঝ হয়ে যায়।

শ্রেয়া এখন বিছানার ধারে বসল।

বলল, সবাই হয়না। বয়েস হওয়া মানুষ সব বাড়িতেই আছে।

না মানে, কেউ কেউ আবার বেশী অবুঝ সেণ্টিমেণ্টাল হয় কিনা।

তারা দুঃখ পাবেই। তাদের দুঃখ কমাবার সাধ্য কারো নেই। একটার সমাধান হলে আর একটা নিয়ে দুঃখ পাবে।

নীপুর হঠাৎ এখন টাইয়ের ফাঁসটা বেশী টাইট হয়ে গেছে। তাই মুখটা লাল করে সেটা নিয়ে টানাটানি করতে থাকে।

শ্রেয়া এখন বলল। সোফা সেটটা কবে ডেলিভারি দেবে ?

বলেছে তো পরশু। স্বপনকে দোকানের ঠিকানা দিয়ে বলেছি সঙ্গে আসতে বাড়ি চিনিয়ে নিয়ে।

স্বপন শ্রেয়ার ছোট ভাই।

লেখাপড়া তেমন এগোয়নি, পাড়ার নেতা। এ বাড়িরত আসতে খুব ভালবাসে ; 'দীপুদা' তার হীরো।

শ্রেয়া একটু বিরক্ত হল, স্বপনকে আবার খাটানো কেন ? ঠিকানা দিলে দোকান থেকে ডেলিভারি দেয় না ?

দেয়, তা কি নীপুই জানেনা ?

কিন্তু নীপ্ন আগে একটা বোকামি করে বসেছে। মাকে বলেছে সোফাসেটটা শ্রেয়ার বাপের বাড়ি থেকে দিচ্ছেন বিয়ের সময় দিয়ে উঠতে পারেননি বলে। হঠাৎ নিজে একটা শৌখিন সোফাসেট করতে দিয়েছি বলতে যে কেন মুখে বাধল ছাই। এখন তার জের টেনে মরো।

নীপু বলল, ওই আর কি মাকে একটা কথা বলে ফেলেছিলাম।
কেন ফেলেছিলে সেটাই আশ্চর্য।
শ্রেয়ার স্বর আরো গম্ভীর বিরক্ত।
আমি এই সব লুকোচুরি দুচক্ষে দেখতে পারিনা। কেন, তোমার কি শখ করে কিছু একটা করার অধিকার নেই?

অধিকার আছে কি নেই, সেটা এখন বোঝাতে বসা শক্ত। প্রাণাধিক প্রিয়তমার কাছেও কি কিছু লুকোচুরি করতে হয় না?
অফিসে কেউ যদি ধার চেয়ে বসে, যদি নয়, বসে। কেবলই বসে। কেউ নয় অনেকেই, কারণ নিপুণ ঘোষালের মাইনে বেশী, মন নরম, এখনো বাপের হোটেলে থাকার সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবান। একালে আর এমন স্বর্ণসৌভাগ্য কজনের আছে? অতএব—
মন নরম না হাতী, নীপু ভাবে লোকের অনুরোধ এড়ানো এই পর্যন্ত।
কিন্তু সেই দুর্বলতার কথা কি বৌয়ের কাছে প্রকাশ করা যায়?
আগে আগে ধার দেওয়া শুনলেই দারুণ চটে যেত শ্রেয়া, কাজেই এখন আর তাকে বলে না।

শুধু শুধু চটিয়ে লাভ কি? নীপুর নীতি সাপও মরে লাঠিও না ভাঙে। শ্রেয়ার আবার ঠিক তার উল্টো। সাপ মরুক আর না মরুক, আগেই লাঠিটা ভেঙে বসবে। এত সত্যসন্ধ হবারই বা কি আছে?
বলতে হয় কাজেই অগতির গতি মাকে। যে মহিলা আজীবন লাঠি আস্ত রেখে সাপ মেরে এলেন।

তিনিই আশ্বাস দেন, দিয়েছিস বেশ করেছিস নেহাৎ অভাবে না পড়লে কি আর মানুষ ধার চায়? যাক ও আমি ঠিক চালিয়ে নেব।
সেই মার সামনেই বা হঠাৎ কী করে একটা শৌখিন আসবাব কিনে এনে সাজানো যায়? অথচ শ্রেয়া ওইটার জন্যে কবে থেকে পাগল হচ্ছে।

সেও কি শুধু নিজের জন্যেই করছে না। মাঝখানের হল খাঁ খাঁ করে, দু একটা বেতের চেয়ার আর কাঠির মোড়া দিয়ে সেই শূন্যতার পূরনের লজ্জাজনক চিত্রমাত্র দেখা যায়।

শ্রেয়া সেই জায়গাটাকে লোকেদের বাড়ির মত সুন্দর করে সাজাতে চায়, এতে দোষের কী আছে? সব দিক ভেবেই নীপুর এই এক নাটক সৃষ্টি। শ্রেয়া এটা মাকে বলতে রাজী হয়নি, অগত্যা নীপুকেই বলতে হয়েছে শালা মারফৎ। শালার মা নিমেষেই বুঝে নিয়েছেন সায়ও দিয়েছেন অথচ শালার দিদিটা বলে কিনা 'তোমার কি কিছু একটা শখ করবার অধিকার নেই?'

নীপু হঠাৎ ইচ্ছে করে নিপুণ বাঁধা টাইটায় একটা টান মেরে টাইট করে ফেলে হাত নেড়ে বলে, এই, বিধবা হয়ে যেতে না চাও তো ঠিক করে দাও এটা।

তৎপরেই ঘড়ির দিকে তাকিয়ে, উঃ! মার্ডারকেস! বলে দ্রুত চম্পট।

আপাত রক্ষা তো হল।

বেশীর ভাগ সংসারী মানুষ তো ওই আপাতটাই বোঝে।

যেমন বোঝেন দেবীপদ।

দালানে পার্টিশান পড়ায় রান্নাঘরটা বেশ গরম হয়ে গেছে, উঠোনের ওদিক থেকে একটু একটু হাওয়া আসত।

তবু নীহারকণা গলদঘর্ম হয়ে রান্নার শেষে বিকেলের জলখাবার বানিয়ে রাখছেন। বুলিটা কলেজ থেকে আসে, তখনই ওর বেশী খিদে, টুলিরও তাই ছিল ইস্কুল থেকে এসে 'ঘর খাই বাড়ি খাই'। এখন দুটি বেলায় ভাত খায় মা বৌদির সঙ্গে, তাই বিকেলের চাহিদা কম। ছোটবাবুর তো সবই অনিশ্চিত। অনিয়মই

ওর নিয়ম। তবু তার জন্যেই সব পরিপাটি করে গুছিয়ে রাখতে হয়, কখন যে চেয়ে বসবে ঠিক নেই। হয়তো দেড়টার সময় ভাত খেয়েও, হঠাৎ তিনটের সময় বলে ওঠে, মা কি আছে দাও, সেঁটে নিয়ে চলে যাই, ফিরতে গভীর রাত হতে পারে।

'কিছু' আছে কিনা বলে না, 'কি আছে' বলে। কাজেই মজুত রাখতেই হয়।

নীপুও বাইরে টাইরে খেতে তেমন ভালবাসে না, বাড়ি ফিরেই খায়।

নীহারকণার একটা নিঃশ্বাস পড়ল, দেবীপদরও সেই অভ্যাস ছিল, বাড়ি ফিরে খেতেন, এবং ভাল করেই খেতেন। বরাবরই ছেলেমেয়েদের থেকে ওঁর খাওয়া টাওয়া ভাল। এই সেদিনও অফিস থেকে ফিরে একবাটি ঘুগনি, একগোছা পরোটা, খান দুই বড় বেগুন ভাজা খেয়ে জলখাবার সেরে, আবার রাত্রে ভাত খেয়েছেন। এখনই সব গড়িয়ে গেছে।

আহা কী সুন্দর ছিল সেই দিনগুলো।

বুড়ো বয়সেও মানুষটার অফিস থেকে ফেরার সময় আসন্ন হয়ে এলেই একটা চাঞ্চল্য, একটা উত্তেজনা, একটা রোমাঞ্চ অনুভব করেছেন নীহারকণা।

তখন যেন 'জীবন' বলে একটা জিনিস ছিল। সাতান্ন আটান্ন বছর বয়সেও দেবীপদ টগবগে যুবা ছিলেন, চলন্ত ট্রাম থেকে নাববার বাহাদুরীটি তখনো ছিল। ফিরতেন, এসেই হৈ হৈ করতেন, খেতেন, ছেলেমেয়েদের ডেকে গল্প করতেন, একজন বলিষ্ঠ পুরুষের উপস্থিতিতে বাড়িটা গমগম করত।

কটা বছরই বা আগে সেটা?

রিটায়ার করার পর থেকে এই তিন সাড়ে তিনটে বছরের মধ্যে মানুষটা যেন একেবারে বদলে গেল। কাজেই সকলেই বদলাচ্ছে।

শুধু এই নীহারকণা ঘোষালেরই বদল নেই?

একটা ক্ষুব্ধ হাসি হাসলেন নীহারকণা। আমি এখনো সকলের তালে তাল দিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু ভাবি, মানুষের পূর্ণ কর্মক্ষমতা আর কর্মোদ্যম থাকতেও জোর করে অবসর নিইয়ে দেয় কেন? অলস মস্তিষ্কই তো জঞ্জালের ভাঁড়ার হয়ে দাঁড়ায়। আর চালু শরীরটা কাজের অভাবে অকাজ করে বেড়ায়।

এই যে এখন এতটা বেলা হয়ে গেল, রোদের মধ্যে কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে মানুষটা! সর্বদা ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকা, ওই বুঝি প্রেসার হাই হয়ে বসল। বলবারও তো জো নেই এতবেলা অবধি রোদে রোদে ঘোরবার দরকার কী তোমার? কে বলতে পারে তাতেই চটে উঠবেন কিনা। মুস্কিল এই কারো কাছে ভাবনাটা প্রকাশ করারও উপায় নেই আর এখন। আগে মেয়েরা কথার সঙ্গী ছিল, এখন তারাও ওপর তলার জীব হয়ে গেছে। উভয় অর্থেই।

মেয়েদের ডেকে ডুকে বললেও হয়তো উড়িয়ে দিয়ে বলে উঠবে বাবার আক্কেলের ব্যাপারে এখনো তুমি অবাক হও মা? সত্যি, তুমি না যা একখানা একদম পিওর হিন্দুনারী।

ছোটটার আবার বেশী কটকটে কথা।

দেবীপদই হঠাৎ বুড়িয়ে গেছেন, কিন্তু সবাইতো তা যায়না।

বাল্যবন্ধু বলাই চাটুয্যে বন্ধুকে দেখে হৈ হৈ করে উঠলেন, আরে কী ব্যাপার? তুই? রাস্তা হারিয়ে ফেলে না কি? এ কী বুড়োটে চেহারা করে বসে আছিস এরই মধ্যে। এইতো সেদিন তোর অফিসে দেখা করতে গেছলাম। দিব্যি ইয়াং চেহারা—

দেবীপদ হাসলেন, 'সেদিন' মানে বছর চারেক আগে। রিটায়ারই তো করেছি সাড়ে তিন বছর হয়ে গেল।

সর্বনাশ। এরই মধ্যে রিটায়ারও করে ফেলেছিস? মোষ্ট সিনিয়ার। আমি শালা জুনিয়ারই রয়ে গেলাম। রিটায়ারের স্বপ্নও দেখার আশা নেই।

এ একটা লীলা।

বলাই তো কখনো কারো চাকরিগিরি করেনি। বাপের ব্যবসায় বসেছে, বাড়িয়েছে, বাড়াচ্ছেও। কলকাতায় খান চারেক বাড়ি, বাপের আমলেরই অবশ্য, ভাড়া খাটে। খুব হয়তো বড় সড় কিছু নয় তারা, তবে আছে।

বাসাবাড়িটা অবশ্য দেখার মত। সাজ সজ্জা দেখেও তাক লেগে যাচ্ছে।

দেবীপদর যেন একটু হিংসেই হল। বসে পড়ে বললেন, তুই তো চেহারাখানা দিব্যি ডাঁটুস রেখেছিস।

আরে ভাই, চেহারা খানা ডাঁটুস না রেখে উপায় আছে? শালার তো কাজই হচ্ছে চেহারা দেখিয়ে আর বচন ঝেড়ে বেড়ানো। এখনকার বিজনেস তো শুধুই জিনিস বেচা কেনা নয়, নিজেকেও বেচা কেনা।......এই তো সম্প্রতি শ্রীলঙ্কা ঘুরে এলাম, সামনের মাসে হয়তো ক্যানাডায় যেতে হবে। কাজও আছে, তাছাড়া মেজ ছেলেটা রয়েছে দেখে আসা হবে।

দেবীপদর অকারণ কেমন রাগরাগ আসে। অথচ রাগের কিছু নেই। বলাই তাকে এক সোফায় বসিয়ে পিঠ চাপড়ে 'তুই তুই' করে কথা বলছে।

বললেন বড় ছেলে কী করে?

বিজনেস দেখছে। ছোটটার লেখাপড়ায় মন নেই, একটা নাচের দল না কি খুলেছে, সেইটা নিয়ে আমেরিকায় যাবে বলে নাচছে। সব স্বর্গের শেষ স্বর্গতো ওই আমেরিকা। আমি বলে দিয়েছি, ব্যাটা আমি তোমার গ্যারাণ্টার হচ্ছি না, নিজে নিজে যা পারো কর। সবই মুখের হুমকি, বুঝছিসই তো? সংসার যে কী ঠাঁই। শেষ

পর্যন্ত হতেই হবে। ছেলে ব্যাটা কতকগুলো বাঁদর জুটিয়ে নিয়ে দশদিন গড়িয়ে জীবন সার্থক করে আসবে, আর টাকার ঘণ্ট করবে।

মেয়েদের খবর কী?

প্রসঙ্গ পালটাল দেবীপদ, তবু যদি মাটো কিছু শুনতে পান। বিয়ে হয়েছে ডিভোর্স হয়ে গেছে।

কিম্বা—

কিন্তু ততক্ষণে তো গাড়ি স্টার্ট দিয়েছে।

বড়টার তো বিয়ে দিয়েছি জানিস? হঠাৎই হয়ে গেল, কাউকে বলতে পারি নি। আমিও তখন নাইরোবি যাব বলে ঠিক করেছি। তা'ছাড়া অসবর্ণ বিবাহ, বুঝলি কি না? যাকগে বিয়েটা খারাপ হয়নি। জামাই ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনীয়ার, পুনায় পোস্টেড্‌ শীগগিরই বাইরে যাবে মনে হয়, দু'একটা অফার পেয়েছে।···মেজটা তো জবরদস্তি করে ডাক্তারী পড়া ধরেছে। মাও ধরতে দেবে না মেয়েও ছাড়বে না, শেষ পর্যন্ত যা হয়, আমিও কন্যের পক্ষ নিলাম। বলি যার যা ঝোঁক তাকে তা হতে দাও। আর ছোটটা? ইলেভেনে পড়ে, ক্লাসে কখনো ফার্স্ট ভিন্ন সেকেণ্ড হয় না, কিন্তু কী বলব ভাই তোকে, এই বয়সে ডানা মেলেছে। পাড়ার যত মস্তান সবাই তার দাদা। দলপতিটাকে লটকেছে, হরদম তার সঙ্গে ঘোরাঘুরি করছে। গিন্নী তো আমায় তুলো ধুনছেন, মেয়ে আটকাচ্ছি না বলে। আমি বাবা সোজা বলে দিয়েছি পাহাড়চূড়ো থেকে বল গড়িয়ে দিলে যেমন আর তাকে আটকাতে পারা যায় না, এও তাই। যখন কোনোখানে মুখ থুবড়ে পড়বে, তখন আপনিই আটকে যাবে। যাকগে আমি ওদের পৃথিবীতে এনেছি বলেই তো আর সারাজীবন হাতের মুঠোয় রেখে দিতে পারব না। তবে হ্যাঁ, বাপের কর্তব্য হিসেবে, যাতে না রাস্তায় পড়ে, তাই একখানা করে বাড়ি তিন মেয়ের নামেই লিখে দেবো, আর একলাখ দুলাখ যা জোটে নগদ। ব্যাস। আর আমার দায়িত্ব নেই।

শুনতে শুনতে সমানেই দেবীপদর মনে হচ্ছিল, স্রেফ গুল ঝাড়ছে বলাইটা। সব বানানো। নিজের মহিমার ছটা ছড়াতে ছড়াতে মাত্রা জ্ঞান থাকছে না। স্কুলেপড়া মেয়ে পাড়ার মস্তানদের সঙ্গে প্রেম করে বেড়াচ্ছে। সেটাও বড় গলা করে বলতে হবে। যেন কী একটা বাহাদুরী।

কালোবাজারী করে টাকার পিরামিড বানিয়েছ যাদু, তাই এত দিলদরিয়া মস্তানি। সব মেয়েকে একখানা করে বাড়ি দেব। দুলাখ করে নগদ দেব। তা' দিবি না কেন, দুধে তো হাত পড়বে না।

বাল্যবন্ধুর প্রতি ছিটে ফোঁটাও ভালবাসা খুঁজে পেলেন না দেবীপদ। মনে হল, ও যেন দশতলার ছাদ থেকে নীচের মাঠে দাঁড়িয়ে থাকা হতভাগা বাল্যবন্ধুটার দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছে।

হয়তো এটা দেবীপদর নিজের আয়নার প্রতিফলন।

আসলে আশার অতিরিক্ত প্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়লে মানুষের এই দশাই হয়। সাফল্যের আহ্লাদটা মাপের পাত্রটায় ধরে না। উপছে উপছে পড়ে। সেই আহ্লাদটা আত্মপ্রেমে পরিণত হয়ে যায়। নিজেকে ছাড়া আর কাউকে দেখতে পায় না, নিজের কথা ছাড়া আর কারো কথা শুনতে পায় না, এবং বিশ্বশুদ্ধকে ডেকে ডেকে বলে, আমাকে দেখো, আমার কথা শোনো, আমার সাফল্যের পরিমাপ করো।

হঠাৎ হলে এই রকমই হয়।

কিন্তু এত কখন হল? কবে?

বলাইয়ের বাবার কলকাতায় বেশ গোটা কতক বাড়ি আছে, আর বলাইয়ের বাবা বিজনেস করেন এইটাই জানা ছিল, এবং বলাইয়ের কলেজে ঢুকেই সেটা ছেড়ে দিয়ে সদ্য পরলোকগত বাপের গদিতে গিয়ে বসতে হয়েছিল এইটুকুই জানা। এতদিন জানেন তাই চলছে। কিছু বাড়াচ্ছে।

এর ফাঁকে কখন কোন সূত্রে এমন হল যে লোকটা পৃথিবী চষছে ?

এতই যদি, তো বাল্যবন্ধুর ছেলের বিয়েতে কই কোন একটা মুক্তোর মালা দিয়ে আশীর্বাদ করলি ? হুঃ। কিছুই দিয়েছিস কি না সন্দেহ। না হলে সেই রাশির মাল ডুরে শাড়ি ফাড়ি দিয়েছিস একটা। উত্তম কিছু হলে নিশ্চয় শুনতে পেতুম।

অথচ নিজেব কথা বলেই চলেছে বলাই, আমি শালা ঠিক করে রেখেছি। মরার আগে নিজের নামে হাসপাতালে একটা বেড্ করে দিয়ে যাব। পরে কেউ করবে নাতো। ···কই তোকে কেউ চা টা দিচ্ছেনা কেন ?

দেবীপদ বললেন, থাক থাক এত বেলায় আর—

তা'বটে। বারোটা বাজে—আর একদিন আসিস। চলে আয়-না সবাই মিলে একদিন আমার ডায়মণ্ডহারবারের রেষ্ট হাউসে। ওঃ যা অপূর্ব পরিবেশ। এলে দেখিস দারুণ ভাল লাগবে ফিরতে ইচ্ছে করবে না।

ও বাবা ! তবে তো না যাওয়াই ভাল।

দেবীপদর এখন মনে পড়বার কথাটা মনে পড়ল। হঠাৎ আমি বলাইয়ের কাছে এসেছিলাম কেন ?

ভাবতে মনে পড়ল।

বলাইয়ের কিছু ভাড়াটে বাড়ী আছে। নিশ্চয় তাদের নিয়ে ঝঞ্ঝাটও আছে, ভাড়াটে উচ্ছেদের রীতিনীতিও নিশ্চয় জানে। এই ভেবেই আমি—

ঝপ করে বলেই ফেললেন, আচ্ছা, তুই তো অনেক বাড়ীর মালিক বলতো সহজে ভাড়াটেকে তোলা যায় কি করে ?

সহজে ? হো হো হো।

বলাই চাটুয্যে হাসতে শুরু করলেন। শিবের অসাধ্য। বুঝলি দেবী, শিবের অসাধ্য।

তোর মত ভীমকর্মার কাছেও ?

হ্যাঁ ভাই। আমার মত ভীমকর্মার কাছেও। একমাত্র উপায় মোটা টাকা সেলামী দিয়ে দাঁতে কুটো নিয়ে গিয়ে পায়ে পড়া।

দেবীপদ চমকে ওঠেন, বলিস কী ? তুইও একথা বলছিস ?

আমি ? আমি তো কোন ছার, স্বয়ং সরকারই হেরে যাচ্ছে। কিন্তু তোর আবার এ চিন্তা কেন ? ফ্ল্যাট বানিয়ে ভাড়াটাড়া দিয়েছিস নাকি ?

আরে দূর। একি বলাই চাটুয্যে ? অভাগা দেবী ঘোষাল পুরনো একতলার ওপর দোতলা তুলতেই ফ্ল্যাট। আবার ফ্ল্যাট বাড়ি। দোতলা তুললাম জায়গার স্বচ্ছলতা করতে ! তো ছেলে বাবু বৌকে প্লিজ করতে—

সংক্ষেপে মাষ্টার মশাইদের ঘটনাটা বন্ধুকে জানান দেবীপদ।

বলাই চাটুয্যে কী মনে মনে হাসবে না ? ভাববেনা হায় হায় এই। এর জন্যে এসেছে পরামর্শ নিতে ? পুরনো একতলার দু'খানা ঘর।

সে রকম অবশ্য কিছু বলল না বলাই, সিগারেটটা ঠোঁটের ফাঁকে ঝুলিয়ে বললো তা কী করছে ? ভাড়া দিচ্ছে না ?

না, না তা নয়—

তবে ? বাড়ি নষ্ট করছে ? দেয়ালে গজাল পুঁতছে ?

নাঃ ওসব কিছু নয়—

দেবীপদ চোখ বুজে দৃশ্যটা ভেবে নিলেন। সে প্রশ্ন তো আসেই না ! বরং এমন চমৎকার করে সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছে, নিজেদের সেই ঘর দুটো বলে চিনতেই পারা যায় না। উঠোনের যে কোণটায় চট চাপা দিয়ে নীহারকণার গুল ঘুঁটে থাকতো সেখানে ওরা টব বসিয়ে বসিয়ে দিব্যি একখানা ফুল বাগান বানিয়ে ফেলেছে।

বলাই সিগারেটটা আরো ঝুলিয়ে বলল, তবে ব্যাপারটা কী ? মদ খেয়ে হল্লা করে ?

ধ্যাৎ। সেরকম লোকই নয়।

এও নয়, ও-ও নয় কিছুই নয়, তবে আর উচ্ছেদের কথা উঠছে কেন হে?

দেবীপদ যেন কোণঠাসা হয়ে যাচ্ছেন, নিজের দিকে মালমশলা খুঁজে পাচ্ছেন না, তাই মনের জোর করে বলে ফেলেন, সংসার ভাঙছে।

অ্যাঁ! সংসার ভাঙছে মানে? বুড়ো বয়সে তোর গিন্নী ভাড়াটে কত্তার প্রেমে পড়েছে না কী?

নাঃ তোর আর জীবনে ছ্যাবলামি গেল না। সংসার ভাঙছে কুপরামর্শ দিয়ে। তলে তলে কুপরামর্শ দিয়ে ছেলে বৌয়ের মতি বুদ্ধি বিগড়ে দিচ্ছে।

ওহো হো! শালা দেবী ঘোষাল, এখনো এত বুদ্ধু আছিস তুই? মতি বুদ্ধি জিনিসটা তো বিগড়োবারই। বিগড়োবার জিনিস বিগড়োবে না? ভাড়াটেরা নিমিত্ত মাত্র। ওরা না হলে আর কেউ নিমিত্ত হতো। এই 'দোষ' দেখিয়ে কেস ঠুকবি তুই? নো চান্স! যা বুঝলাম, মোটামুটি ভদ্রই তোর টেনাণ্ট। একটা ভদ্র ভাড়াটে পাওয়া ভাগ্যের কথা। তা ব্যাপারটা কী ঘটে? শাশুড়ী বৌতে রোজ রোজ ধুন্ধুমার বেধে যায়? আর ছেলে এসে বৌকে সাপোর্ট করে?

দূর। তা'হলেও তো কথা ছিল।

দেবীপদ অবজ্ঞার গলায় বললেন, শাশুড়ী বৌতো একেবারে আমে-দুধে। শাশুড়ী বৌতে মার্কেটিঙে যাচ্ছেন, সিনেমায় যাচ্ছেন, মুক্তাঙ্গনে থিয়েটার দেখতে যাচ্ছেন, সারা সন্ধ্যে কাছাকাছি বসে টি, ভি, দেখছেন। মেয়েদের থেকে বৌমার আদর বেশী।

বলাই হতাশ গলায় বলেন, তুই আমায় তাজ্জব করলি দেবী। যা বাবা, মাথাটার চিকিৎসা করাগে যা। হা হা হা। ওঃ। গিন্নী বাড়ি থাকলে একবার তোর সমস্যার কথা বলতাম তাঁকে, তো রোজ

সারা সকাল দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে বসে থাকেন তো। সেই বেলা তিনটেয় ফিরে ভাত খাওয়া। স্পেশ্যাল একখানা অষ্টিন ওনার জন্যে বরাদ্দ আছে, যেখানে খুশী যাও, যা খুশী করগে। আমি শালা কারুর ধার ধারিনা। অনেক দিন পরে দেখা হয়ে বেশ ভাল লাগল। চলে আসিস মাঝে মাঝে, রিটায়ার করে তো বাড়ী বসে ভ্যারেণ্ডা ভাজছিস। ভাড়াটেকে বাঁশ দেবার চিন্তায় সময় নষ্ট না করে চলে এসে আড্ডা জমাবি। অবশ্য আমি কখন কোথায় থাকি ঠিক নেই, পারিসতো একটা ফোন করে আসিস। আমার ফোন নম্বর হচ্ছে—আচ্ছা গাইডেই তো পেয়ে যাবি। আচ্ছা—

পিঠে বড় একটা থাবড়া বসিয়ে, প্রায় দরজা অবধি ঠেলে দেয় বাল্যবন্ধু। অস্বীকার করা যায়না সেই থাবড়ায় অন্তরঙ্গতা আছে। তবু—

হ্যাঁ তবু রাগে জ্বলতে জ্বলতে বন্ধুর প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলেন দেবীপদ। প্রাসাদই। আগে এতখানিটা ছিল না। পাশের ছাড়া জমিটাও ও কাজে লাগিয়েছে।

তা এসবের জন্যেও তো দর্শক চাই শ্রোতা চাই?

রাগের কোনো কারণ নেই, অথবা এমন কী কারণ? তবু রাগে শরীর মন জ্বলতে লেগেছে। পেটটাও তার সঙ্গে—

ভূতে পেয়েছিল আমার, তাই বড়লোকের কাছে গিয়েছিলাম পরামর্শ চাইতে। ব্যাটা কালোবাজারী স্মাগলার! আজ এখানে কাল সেখানের মানে বুঝিনা আমি? ওরে ব্যাটা এই দেবীপদ ঘোষালও এমন জায়গায় চাকরী করে এসেছে, ইচ্ছে করলে ঘুষ খেয়ে লাল হয়ে যেতে পারত। করেনি। কারণ সে সৎপথটাই চিনেছিলো। রাগের বশেই ভিতর থেকে একটা পৌরুষ চাড়া দিয়ে উঠল।

মনে মনে বলল, আচ্ছা আমিও দেবীপদ ঘোষাল। কোনো পরামর্শের ধার ধারি না, আইন নিজের হাতে নিয়ে, সবাইকে টিট করে ফেলব।

বাসস্টপের কাছে একটা ছোট্ট ষ্টেশনারি দোকান।

বাসে উঠে পড়বার আগে তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। গোটা কয়েক লজেন্স কিনে মুখে ফেললেন। আর সহসাই একটা জিনিস চোখে পড়ল। অবাক হয়ে দেবীপদ থমকে দাঁড়ালেন। আর কিছুই নয়, বিধাতার নির্দেশ। না দ্বিধার কিছু নেই আর।

গটগট করে এগিয়ে গেলেন দেবীপদ ছেলের বৌয়ের ঘরের দিকে। দৃঢ় গলায় ডাকলেন, বৌমা!

শ্রেয়া তাড়াতাড়ি খোলা চুল আর আলগা শাড়ী সামলে দরজার কাছে চলে এল। দেবীপদ কর্তার গলায় বললেন লেটার বক্সের চাবিটা আমার কাছেই থাকবে।

শ্রেয়া বোধহয় একটু থতমত খেল, তারপরই তার মুখে ফুটে উঠল একটু মসৃণ হাসি।

অতঃপর টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটি রিং বার করে তার থেকে একটু চাপ দিয়ে কৌশলে ছোট্ট চাবিটি খুলে নিয়ে চাবিটা শ্বশুরের প্রসারিত হাতে এগিয়ে দিল। দিয়ে খুব অমায়িক গলায় বলল, আমিও ভাবছিলাম আপনার কাছেই থাক। আমার পিসিমা বলেন মাথার বালিশের তলায় একটু লোহা থাকা ভাল।

ঢুকে গেল ঘরের মধ্যে।

এটা আবার কী হল।

দেবীপদ যেন কেমন মুসড়ে গেলেন। ভেবেছিলেন দিতে ইতস্তত করবে, হয়তো বা বলবে, 'খুঁজে পাচ্ছিনা', দেবীপদ তখন রাগ দেখাবেন, কিন্তু এটার মানে? দেবীপদর মা বলতেন বটে বালিশের তলায় লোহা রাখতে হয়, কিন্তু সে তো বাচ্চা ছেলেদের।

ঘরে চলে এলেন। লজেন্সের দোকান থেকে বেশ দাম দিয়ে

ছোট্ট একটি ঝকঝকে রিং কিনে এনেছিলেন চাবি আদায় করে ফেলেই তা'তে পরিয়ে নেবেন বলে, এখন আর তেমন উৎসাহ পেলেন না। বিছানার ওপর ফেলে রাখলেন দুটোই। শুলেনও না। বসে রইলেন পা ঝুলিয়ে।

দেবীপদর দেরী করে ফেরার জন্যে খাওয়া দাওয়ায় তো অনেক দেরী ঘটে গেছে তবু অভ্যাসবশতঃ একটু গা গড়াতে এসে—বিছানায় পড়ে থাকা জিনিসটা দেখে নীহারকণা চমকে গেলেন, এটা কী?

দেবীপদ খাটের ওপর পা ঝুলিয়ে বসেছিলেন, গম্ভীর ভাবে বললেন, দেখতেই পাচ্ছ।

সেই হতচ্ছাড়া পাপ চাবিটা?

দেবীপদ কথা বললেন না।

নীহারকণা রিংটা তুলে নিয়ে রুষ্ট গলায় বললেন, এটা কোথা থেকে এল।

কোথা থেকে আবার, দোকান থেকে।

তুমি এনেছ?

তবে কি তুমি এনেছ?

এটা অবশ্যই সরাসরি উত্তর দেবার দায় এড়ানো।

এই অমূল্য জিনিসটি কিনে ফেলে নাচতে নাচতে এসে চাবিটা বৌমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে এলে?

হঠাৎ কেঁদে ফেললেন নীহারকণা, তোমার জন্য কি আমি মাথা খুঁড়ে মরবো গো? এ আবার কী দুর্বুদ্ধি হচ্ছে তোমার?

কান্না দেখে একটু ঘাবড়ে গেলেন দেবীপদ, এবং নিজের সপক্ষে যুক্তি দেখাতে, গলায় একটু সেন্টিমেন্টের ছোঁয়া লাগিয়ে বললেন, লেটার বক্সটা নিজে শখ করে করিয়েছিলাম—

নীহারকণা জল এবং আগুনে মিশ্রিত স্বরে বললেন, সে তো তুমি এই সমগ্র সংসারটাই করেছ, এই বাড়িঘর জিনিসপত্র কোনটা তোমার করা নয়? তবে কি সব চাবি বন্ধ করে নিজের কাছে রেখে দেব?

ঠিক আছে দিয়ে আসছি।

দোহাই তোমার আর কেলেঙ্কারী কোরো না।

মাটিতে একটা বালিশ ফেলে শুয়ে পড়লেন নীহারকণা।

দেবীপদ হঠাৎ বোধহয় সাফাই গাইতেই এক সময় বলে উঠলেন, তুমি তো এত সব বলছ, অথচ বৌমা বলল, 'আমিও ভাবছিলাম ওটা আপনার কাছে থাকাই ভাল'।

নীহারকণার অজান্তেই বোধহয় তাঁর গলা থেকে একটা তীক্ষ্ণ প্রশ্ন ছিটকে উঠল, কী?

ওই তো বলল, 'আমার পিসিমা বলেন, মাথার বালিশের তলায় একটু লোহা থাকা ভাল'।

নীহারকণা উঠে পড়ে বালিশটা খাটের উপর রেখে দিয়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

নীচের তলায় তখন একটা চাপা হাসির ঢেউ চলছে। খাবার টেবিলের চারপাশের চেয়ারগুলো দখল করে বসে আছে দীপু,•টুলু সদ্য কলেজ থেকে আসা বুলু এবং শ্রেয়া। সকলের সামনেই অর্ধভুক্ত চায়ের পেয়ালা।

মাকে নেমে আসতে দেখেই টুলু বলে উঠল বাবার সেই হৃত সাম্রাজ্যটা তাহলে উদ্ধার হল?

দীপু বলল, মাইরী মা, ফাদার দেখালেন বটে একখানা। বাঁধিয়ে রাখবার মত।

বুলু বলল, থাম ছোড়দা, লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। দাদা এসে শুনে কী বলবে তাই ভাবছি।

শ্রেয়া নিজস্ব শান্ত গলায় বলল, বলবে আবার কী? কী এমন ব্যাপার। একটা অভ্যস্ত জিনিসের অভাবে হয়তো অস্বস্তি

ফিল্ করছিলেন। বালিশের তলায় থাকত বরাবর; না থাকায় ঘুমটুমের ব্যাঘাত হচ্ছিল। এমন হয় মানুষের।

নীহারকণা সামনের ওই চারখানা চাপা হাসি মাখানো মুখের দিকে তাকালেন। চারখানাইতো পরের বাড়ি থেকে আসা নয়।

নীহারকণা এখন কি করবেন?

তখনকার মত হঠাৎ কেঁদে ফেলে বলে উঠবেন, 'চুপ কর তোরা, আমি আর পারছি না।'

না কি একান্তই একগণ্ডা আততায়ীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে লড়াইয়ে নামবেন? বলবেন, আসপর্দারও একটা সীমা থাকা উচিত, অসভ্যতার একটা মাত্রা। খবর রাখিস কি প্রবল চাপের নীচে আমরা জীবন কাটিয়েছি। কত অবুঝ বদমেজাজী, স্বেচ্ছাচারী সহানুভূতিহীন কর্তাগিন্নী, যথেষ্ট দাপট চালিয়ে সংসার করে গেছে? তোরা যত ভাল ব্যবহার পাচ্ছিস, যত স্বাধীনতা, যত অবাধ চাপহীন জীবন, ততই অ-সভ্য আর অকৃতজ্ঞ হচ্ছিস? 'গুরুজন লঘুজন' শব্দটা উঠে গেছে তোদের একালের অভিধানে।

লড়াইয়ে নামার জন্যে এই সব আয়ুধ তো সংগ্রহ করতে হবে না নীহারকণাকে। সবই তো ভেতরে মজুত আছে। নীহারকণা শুধু সহসা বিস্ফোরণ হয়ে যাবার ভয়ে তাদের গায়ে হাত ঠেকান না।

তবে এখনই বা কেন আত্মহারা হয়ে হাত ঠেকিয়ে বসবেন?

তবু তো ওরা ওদের তীর-টীরগুলো সরাসরি প্রতিপক্ষের ওপর ছোঁড়েনা, মাধ্যমের মধ্য দিয়েই লক্ষ্যভেদ করতে চেষ্টা করে। সেই-টুকুই করুণা। কিন্তু নীহারকণা কি ওদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে দেন? নীহারকণা তো অবলীলায় জায়গা বদল করে বসেন। ওরা টেরই পায় না লক্ষ্যভেদ হল কি হলনা।

এখনও তাই করলেন।

জায়গা বদল করে ফেললেন।

তীরগুলো শুধু শূন্য ভেদ করল।

সকলকে অবাক করে দিয়ে নীহারকণা হেসে উঠে বললেন, ও সব অভ্যেস টভ্যেসের ব্যাপার নয় শ্রেয়া, ব্যাপার অন্য। হি হি, আমার মা বাচ্চা টাচ্চাদের মাথার শিওরে একটু লোহা রাখতেন, ছুরি পেরেক কাজললতা চাবি যা হোক। সরাতে দিতেন না, সরালে না কি অপদেবতা ভর করবে। সেকালের মানুষতো জানতেন অনেক, ফলতোও ঠিক।

কই গো আমার চা? কেটলি ফিনিস না কি? আছে? তবু ভাল।

নীহারকণার বালিশটা খাটের ওপর রেখে দিয়ে নিঃশব্দে চলে যাওয়ার ভঙ্গীতে দেবীপদ রীতিমত অপমানাহত হলেন।

ভেবেছে কি এরা? সবাই মিলে এককাট্টা হয়ে তাঁকে আসামী বানিয়ে ছাড়বে? কেন? তুমি স্ত্রী, তুমি আমার দলে হতে পার না? আমার হয়ে দুটো ন্যায্য কথা শুনিয়ে দিতে পার না? চিরটা কাল ওদের গোড়েই গোড় দিলে, ওদের দলে নাম লিখিয়েই আমায় কোণঠাসা করে রাখলে। ছিঃ। এই যে আমাকে সর্বস্বান্ত করে শৌখিন দোতলা ওঠানো হল, তুমি বাধা দিতে পারতে না তাতে? বলতে পারতে না আমরা গেরস্ত লোক, এত কেন? মোটামুটি হোক। 'তা' নয়, তুমি ওদের পালে হাওয়া দিলে, বললে, আমারও এটা চিরকালের শখ। একবার বৈতো বারবার হবে না। টাকা তো থাকার জিনিস নয়, তার পাখা গজাবেই। এ তবু একটা পাকা হয়ে থাকবে। ওঃ কত যুক্তি। এই যে হতভাগা দেবীপদ, এখন ফোঁপরা হয়ে বসে আছে শুধু পেনসনের টাকাটি সম্বল, এর জন্যেই না এত হতমান্য। মা বলতেন 'শাঁস থাকলে নাশ হয় না।' তখন কথাটার মানে বুঝতাম না, এখন বুঝছি। হাড়ে হাড়ে বুঝছি।

ধুতির খুঁটটা তুলে নিয়ে নাকটা মুছলেন দেবীপদ।

সেই যে তখন নীহারকণা স্বামীকে জ্ঞান দিতে বলে উঠেছিলেন, শুধু কি ওই তুচ্ছ জিনিসটা? এই ঘর বাড়ি, জিনিসপত্র কোনটা তোমার করা নয়? সেই কথাটাই প্রাণের মধ্যে তোলপাড় করছে। সত্যিই তো এ কথাটা তো এমন করে কোনদিন ভেবে দেখেননি দেবীপদ। এ সংসারের মাথা থেকে পা পর্যন্ত তাকিয়ে দেখলে, সবই তো দেবীপদর আহরণ করা। নীহারকণা তো এখনকার মত বাজার দোকান চষতে যেতেন না তখন। রান্নাঘরের একটা সাঁড়াশী দরকার হলেও বলতেন, দেখে শুনে বেশ শক্ত দেখে নিও বাপু। ফস করে পিছলে গিয়ে যেন ঝোলের কড়া গিন্নীর পায়ে ফেলে দিয়ে তোমার সংসারের বারোটা বাজিয়ে না দেয়।

দেবীপদ পাকে 'চরণ' বলে একটু রসিকতা করে বেরিয়ে গিয়ে নিয়ে আসতেন দেখেশুনে। হয়তো একটার জায়গায় দুটো।

তখনতো খুব একটা সচ্ছলতার অবস্থা ছিল না, তবু জীবনে কত রস ছিল, কত আহ্লাদ ছিল।

এখন অবশ্য বাজার দোকানের ব্যাপারে নীহারকণা দেবীপদর ধার ধারে না, তবে পয়সার ধারটি তো ধারেন? দিব্যি তো গা পাতলা করে বলেন, মেয়ে বৌয়ের সঙ্গে যাচ্ছি, টাকাটা একটু বেশী করে দাও দিকি। বাড়তি একটা কিছু কিনতে ইচ্ছে হলে, যেন বলতে না হয়, 'অই যা আর তো টাকা নেই।

ফোঁপরাও করে রেখেছেন, আবার তাঁর প্রেসটিজের দায়টাও পুরো দস্তুর চাপিয়ে রেখেছেন।

লোক-লৌকিকতা, আত্মীয় জন আসা-যাওয়া, সব কিছুর দায়ই তো নীহারকণার। এবং সব কিছুই বেশ 'ভাল' হওয়া আবশ্যক। এই মহিলা বিভীষণটি নিয়েই দেবীপদর ঘরকন্না।

আর একবার কোঁচার খুঁটটা তুলে নাক মুছলেন। 'সবই যে

আমার অবদান' এই কথাটুকুও তো কই ওদের চেতনায় ঢুকিয়ে দিতে চেষ্টা করেন না নীহারকণা ? তাহলেও তো একটু ন্যায্য হত।

তা' নয়। কখনো নয়। আর শুধু আজ বলেই নয়, চিরকাল ওই মহিলাটির বিভীষণের ভূমিকা। চিরকাল প্রতিপক্ষের দলে।

এতক্ষণে দেবীপদ শুয়ে পড়লেন।

মোটা পর্দার দরুণ ঘরটায় দুপুরেও সন্ধ্যা সন্ধ্যা ছায়া। কী ভাগ্যিস পাখাটা ঘুরছে তাই বিছানায় শোওয়া যাচ্ছে।

শুয়ে পড়ে চোখ বুজে একেবারে বিস্মৃত অতীতে চলে গেলেন দেবীপদ। সে একটা গ্রামের বাড়ির গ্রামোচিত দোতালার শোবার ঘর। মোটা চওড়া বাজু দেওয়া জোরা খাট, দুখানা আলাদা খাট জোড়া দিয়ে এক করা নয়। যুগল অধিকারীর জন্যে তৈরীই।

উঁচু গদি, সাদা ধবধবে চাদর পাতা, মোটা মোটা দুটো পাশ বালিশ এবং ঢাউশ দুটো মাথার বালিশ ও সাদা ধপধপে ঝালর দেওয়া ওয়াড় মোড়া। বিছানার মাঝখানে একখানা কুঁচি দেওয়া ঝালরদার তালপাতার পাখা, সেই লাল টকটকে শালুর ঝালরের পাখাখানা যেন ওই শুভ্রতাকে পরিস্ফুট করেছে। সাজানো ঘর। সম্পন্ন ঘরের নববিবাহিতের উপযুক্ত।

দেওয়ালে দেওয়ালে ফ্রেমে বাঁধানো 'মাটির ছবি'। রাধাকৃষ্ণ, হরগৌরী, রামসীতা, উত্তরা-অভিমন্যু। এছাড়াও দেওয়ালে আটকানো ফুলদানী দেওয়ালগিরি, এবং যাবতীয় গ্রুপ ফটো।

কাঁচের আলমারীতে খেলনা পুতুল সাজানো।

সন্দেহ নেই যে ছেলের বিয়ের আগে 'কলকাতার মেয়ে বৌ আসছে' বলে রীতিমত যত্ন নেওয়া হয়েছে ঘরের। যদিও ছেলে কলকতায় পিসির বাড়ি থেকে অফিস করে শুধু শনিবারে শনিবারে বাড়ি আসবে। তবু বৌ তো থাকবে।

যদিও সেই নতুন বৌ প্রথমেই বরের আনন্দ ভঙ্গ করে বলে উঠেছিল, ঘরে কোন বই নেই ?

যেন এত সব 'থাকা'টা মিথ্যে, বই 'না থাকাটা'ই সত্য।

বর অস্বস্তি বোধ করেছিল, বলেছিল, বই এ ঘরে থাকবে কেন? নীচে বৈঠকখানার আলমারীতে আছে।

আছে? তাও ভাল। কী বই? রামায়ণ মহাভারত।

রামায়ণ মহাভারত তো আছেই। তাছাড়া মোটা মোটা সব গ্রন্থাবলী, বাঁধানো বাঁধানো মাসিকপত্র, অনেক বই। ছোট জ্যাঠা-মশায়ের নাকি খুব বইয়ের ঝোঁক ছিল।

নতুন বৌ আহ্লাদে ভরা গলায় বলেছিল, আমারও খুব বইয়ের ঝোঁক।······ওতেই আমার দিন কেটে যাবে।

বাড়িছাড়া হয়ে থাকা নতুন বরের বুকটা একটু যেন ধক্ করে উঠেছিল। বৌয়ের কথার ভাবার্থ কি এই নয়, 'বই থাকলে সে বিরহ যন্ত্রণাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে পারে।'

তা' ওটুকুতো এহ বাহ্য, রাত্রে ঘরে আসার সময়? তখনই যেন জগতের যত কর্তব্য সারার টাইম। শনি রবি মাত্র তো দুটো রাত। এমন কিছু সেকাল না হলেও গ্রামের বাড়িতে পাঁচটা গুরুজনের মধ্যে তো আর দিনের বেলা দেখা হবার প্রশ্ন নেই। দিন বলতেও তো শুধু রবিবারটা। তা' সেও পাড়াসুদ্ধ যত কর্তা ব্যক্তি, পাড়াতুতো মাসি-পিসি, জ্যেঠি-খুড়ি, 'পুত্র' সন্দর্শনে আসার ঠ্যালায় ভরভরন্ত জমজমাট।

অতএব পরম প্রার্থনার পরম আকাঙ্ক্ষার সপ্তাহের ওই রাতকে বৌ ফালি কেটে কেটে আধখানায় এনে ছাড়ত।

বাড়িতে এত লোক, একদিন কেউ ঠাকুমার পানটা ছেঁচে দিতে পারে না?

'দেবার জন্যে তো হাত বাড়িয়েই থাকে'···

তবে?

ধ্যেৎ তাই কখনো হয়?

কাল সকালে রান্নার শাক বাছা, চাল বাছা, মাথা মুণ্ডুর উকুন বাছা, এসব রাত্তিরেই না করলে নয় ?

উকুন বাছা ! হি হি হি । যা সব বল ! রোজ রাত্তিরে করে রাখি—

রোজ তোমার বর আসে না ।

এমা, সেইটা বোঝাতে হবে না কি ?

না, কোনো কিছুতেই বোঝানো চলবে না তার হতভাগা বর বেচারা অনন্ত ব্যাকুলতা নিয়ে ছুটে এসেছে ।

এই । চিরকাল এই ব্যবহার । চিরদিন অপর পক্ষের সমর্থক ।

ওই মহিলাটি যে আমার নিজের লোক, তা' কোনো দিন জানতে দেবেন না কাউকে । ···তবু কলকাতায় এসে বাসা নেবার পর, এবং পরে এই বাড়িটা বানাবার পর সুখেই ছিলেন দেবীপদ । ···তখন তো ওঁরা এত তালেবর হয়ে ওঠেন নি ।

নীহারকণা আবার বলেন, সব সময় 'ওরা ওদের' এরকম বল কেন বল তো ? 'ওরা' আবার কী ? ওরা আমরা আলাদা দল ?

দল নয় তো কী ? ···দেবীপদ একা একাই গজরান, ওরা আমাদের 'আপন' ভাবে ? তা' যদি ভাবে, তাহলে তো ল্যাঠা মিটেই যেত । ওরা তো সর্বদা সমালোচনার দৃষ্টি উঁচিয়েই আছে ।

···তবে ? ওরা আর আমরা ভাবব না তো কী ?

দেবীপদ জানেন না, ও পক্ষেও ঠিক এই একই অভিযোগ ধূমায়িত হয় । ওরা মনে করে ওঁরা সর্বদা তীব্র সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে আমাদের জীবনের জানলায় চোখ ফেলে বসে আছেন । আমাদের প্রতিটি গতিবিধির ওপর কড়া নজর, আমাদের সমস্ত আচার আচরণের ব্যাখ্যায় 'নিঃশব্দ পঞ্চমুখ ।' ···প্রতিটি ব্যাপারে নিজেদের

কালের সঙ্গে তুলনা করে করে একালটাকে নস্যাৎ করবার চেষ্টা।

কেন? কেন হে বাপু? তোমরাই কি তোমাদের পিতামহ প্রপিতামহের ষ্টাইলে চলেছ? ···তোমাদের ওপরওলারা তোমাদের একটা 'বয়স্ক মানুষ' বলে গণ্য করতেন না। এবং তোমরাও তাদের সুয়ো হবার জন্যে 'চিরখোকা' হয়ে থাকতে। অথবা তোমাদের সাহসের অভাবই তোমাদের বশংবদ করে রাখতো। আমাদের অত ভয় নেই। দুর্দশায় পড়বার ভয়, লোক নিন্দের ভয়, তোমাদের বিরাগভাজন হবার ভয়, এসব আমাদের কাবু করতে পারে না। আমরা আত্মমর্য্যাদাটাকেই 'সার' বলে জানি।

হ্যাঁ এই রকম সব কথা 'ওদের' হৃদয় সমুদ্রেও ঢেউ তোলে বই কি। মন কখনোই নির্বাক থাকতে পারে না, কারো মনই না। সব মনের মধ্যেই কথার ঢেউ, কারো বা ঝড় বয়, কারো বা স্তিমিত।

কাজেই 'ও'রা' আর 'আমরা' এই দুটো শব্দও থাকবেই। নবীনে প্রবীণে, মালিকে মজুরে, পুরুষে নারীতে।

তবে, যে যার আয়নায়।

বুলুর ভারী ভাবনা হচ্ছিল, দাদা এসে আবার বাবার ওই ক্ষুদ্রতার কথা শুনে না জানি কী বলবে। ভাবনাটার নিরসন হল অন্য একটা ঘটনায়। সেই বড় ঘটনাকে অতিক্রম করে তুচ্ছ ঘটনাটা আপাতত মঞ্চে উঠতে পেল না।

নীপু বাড়ি ঢোকার আগেই স্বপন এসে হাজির হয়েছিল, সঙ্গে হুমহুম করে গোটা কতক কুলি।

প্যাক করা সেই সোফা সেট, সেণ্টারপীস, উপরি একটা সুন্দর টেবিল ল্যাম্প।

দীপু স্বপনের হীরো, স্বপনের প্রাণের গুরু।

তাই বিপন্ন বিব্রত স্বপন আগে এসে দীপুকে নিজের বিপদ জানিয়ে সহায় ভিক্ষা করেছিল। এতে যে তার 'জামাই বাবু'র সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা হল সেটা গ্রাহ্য করল না।

দীপু বলল, ঠিক হ্যায়, ঘাবড়াও মৎ। বরের দেওয়া জিনিসকে 'বাবার দেওয়া' বলার সৎসাহস অনেক বাঙালী মেয়েরই আছে। শুনি তো বন্ধু টন্ধুদের মুখে। ওটা কোনো ব্যাপারই নয়।

গোটা আণ্টেক কুলিকে ধুমধাম উঠে যেতে দেখে নীহারকণা তাদের সঙ্গে সঙ্গে উঠে এলেন, অ বুলি, টুলি, অ শ্রেয়া, দেখতো এরা আবার কে। বাড়ি ভুল করে বোধহয়—

এতক্ষণে স্বপন সহ দীপুর আবির্ভাব।

বাড়ি ভুল হতে যাবে কেন? এই যে তোমার···কী বলে···ও বৌদি, তোমার মায়ের সঙ্গে আমাদের মাতৃদেবীর কী সম্পর্ক?

শ্রেয়া ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

অস্বস্তি চোখে একবার পরিস্থিতিটায় চোখ বুলিয়ে নিয়ে সংক্ষেপে বলল, বেয়ান।

থ্যাঙ্কউ। মা, এই নাও তোমার বেয়ানের পত্র।

হ্যাঁ, শ্রেয়ার মার হাতেরই গোটা গোটা অক্ষরে লেখা চিঠি, 'প্রিয় বেয়ান'কে উদ্দেশ্য করে জানিয়েছেন, মেয়ের বিয়ের সময় নানা অসুবিধেয় হয়ে ওঠেনি, তাই এতদিন পরে সামান্য এই উপহারটি পাঠালেন মেয়ে জামাইকে। এজন্য খুবই লজ্জিত, জিনিসটি আপনার পছন্দ হয়েছে জানতে পারলে সুখী হব।

নাও ঠ্যালা।

বলে উঠল দীপু।

নীহারকণা স্বপনকে ধরে, অনেক কথা বললেন, ছি ছি তোমার মা'র শুধু শুধু এত খরচ করা কেন? কোন মানে হয় না। তুমি এতবড় ছেলে মাকে বারণ করতে পারলে না? এ সময় তোমার বাবা বিদেশে, কেন এতসব ঝামেলা পোহান?

স্বপন এতক্ষণে কোনমতে বলে, এ আবার কী ঝামেলা। দোকানে অর্ডার দিলেই তো পাঠিয়ে দেয়। আমি চিঠিটা দিতে এলাম।

ততক্ষণে দীপু হৈ চৈ করে প্যাক খুলিয়ে ফেলেছে, এবং বলে উঠেছে মার্ভেলাস! বাস্তবিক বৌদি, জিনিষটায় টেষ্টের পরিচয় আছে। আর একেই বলে 'সময়োপযোগী।' ···টুলে বসে বসে টি, ভি, দেখা হচ্ছিল। কোন মানে হয়না।

এই সময় নীপু এসে পেঁছিল।

দীপু অস্পষ্ট স্বরে বলল, গুরুচরণ! পরে শুনো। দাদা এসে গেছে। এবার জিনিষটার সেলিব্রেসান হয়ে যাক।···তার সঙ্গে এক রাউণ্ড চা। কি হে স্বপন বাবু, চা-না-কফি?

স্বপন কৃতজ্ঞ গলায় বলল, আপনি যা বলেন।

রাত বলে একটা জিনিষ আছে, এবং নিজস্ব একটা ঘর আছে, এই যা বাঁচোয়া।

বলতেই হবে এটা ভাগ্যের কথা। কজন বয়স্ক দম্পতির এ সুবিধেটা থাকে? এইতো নীহারকণারই তো গত বছর দুই ছিল না।

এ বয়সে কারো ঘরে কুলোয় না, দুজনে দুঠাঁই থাকতে বাধ্য হতে হয়। কেউ বা চক্ষু লজ্জার বশে একটা নাতী নাতনী, কি দ্যাওরপো দ্যাওরঝিকেও টেনে এনে ঘরে ভর্তি করে।—নিরঙ্কুশ বচসার সুবিধে স্বেচ্ছায় খোয়ায়।

আপাততঃ নীহারকণা নিরঙ্কুশ। তাই ঘরে ছিটকিনি ঠেকিয়েই বলে উঠলেন, আচ্ছা তোমায় কি ষাট না হতেই বাহাত্তুরে ধরল ? কী অভব্যতা করলে তখন বলতো ? লজ্জায় ঘেন্নায় মাথাটা কাটা গেল আমার। ছি ছি, তোমার নির্বুদ্ধিতার জ্বালায় কোনদিন না গলায় দড়ি দিতে হয়। ছি ছি।

তা ছি ছিক্কার করবার মতই কাজটা করেছেন বটে দেবীপদ। নতুন আসা আসবাবটায় সকলে মিলে একসঙ্গে বসে চা খাওয়ার প্রস্তাব করে বসল দীপু, দেবীপদ সে কথায় কর্ণপাতমাত্র না করে, 'আমার মাথা ঘুরছে' বলে ঘরে ঢুকে এসেছিলেন।

ঠিক যেন সকলের আমোদের ওপর একটা থাপ্পড় কষিয়ে দেওয়া।

কিন্তু দেবীপদ কি এই ছি ছি কারে লজ্জিত হলেন ?

আদৌ না। বরং ব্যঙ্গের গলায় বলে উঠলেন, তাতে কার কোন ক্ষতিটা হল ? হাহা হিহির কমতিতো কিছু দেখলাম না। অপোগণ্ডদের থেকেও বেশী হিহি তো বাড়ীর গিন্নীর গলা থেকে শোনা যাচ্ছিল। আত্মসম্মান বোধ থাকলে আর—

নীহারকণা গম্ভীর হলেন।

বেদনার গলায় বললেন, কিসে আত্মসম্মান থাকে আর কিসে যায়, এ বোধটা যদি তোমার থাকত। তোমার মান মর্যাদা বজায় রাখতে আমায় বোকা সাজতে হয়।

দেবীপদ উঠে বসলেন।

তাকিয়ায় ঘুষি মেরে বললেন, কেন ? কেন তা, করতে হবে শুনি ? আমরা কারো খাই, না পরি ? না কারো কয়েদখানায় বাস করি ? আমি কর্তা, আমার যা খুশী করব।

নীহারকণা হাত জোড় করলেন।

দোহাই তোমার। যা ইচ্ছে কোরো। এখন আর গলা চড়িও না।

গলা অবশ্য নামালেন তবে অপরাধ স্বীকার করলেন না।

বললেন, এখন দেখছি ওই বলাই চাটুয্যের পথটাই ঠিক। যেন

তেন করে শুধু পয়সা করে ফেলা। টাকার পাহাড়ের চুড়োয় উঠে বসতে পারলে সবাইকে শায়েস্তা রাখা যায়। তবে এও জেনো নির্বুদ্ধিতাতেই আজ এই অবস্থা।

নীহারকণাও উঠে বসলেন, শান্ত গলায় বললেন, তুমি কী রকম অবস্থাটা চাও?

এর আবার বলার কী আছে? যা স্বাভাবিক নিয়ম, সেটাই চাই। বাড়ির কর্তা গিন্নিকে সবাই মেনে চলবে, তাদের ইচ্ছে অনুসারে কাজ হবে—

হবে না।

নীহারকণা বললেন, হবে না। তোমার দেখা নিয়ম একালে চলবে না।

না চলে, আমি সেখানে নেই। সোফাসেটি নিয়ে কত নাটক। আমি কিছু বুঝি না? ঘাস খাই? খেয়ে দেয়ে আর কাজ নেই নীপুর শাশুড়ীর, স্বামী কাঠমাণ্ডুতে পড়ে আছে, আর উনি—

নীহারকণা এই পরিস্থিতিতে হঠাৎ হেসে ফেললেন, বললেন—ওমা! যত বোকা তোমায় ভাবি তত বোকা তো নও তুমি।

দেবীপদর রগের শির ফুলে উঠল, তুমি আমায় খুব বোকা ভাবো, কেমন?

তাই তো ভাবতাম।

বুদ্ধিহীনেরাই অন্যকে বোকা ভাবে।

নীহারকণা নরম গলায় বললেন, তা বটে, তা বটে। তবে নিজে-দের কম বয়েসের কথাও মনে করে দেখো না? শনিবারের রাত্তিরে এক 'অগুরু' উপহার দিয়ে বলেছ এখন দু' তিন দিন মেখোনা, পরে মেখে বোলো বিয়ের দরুণ বাক্সয় ছিল।

দেবীপদ আবার নিষেধ ভুললেন, গর্জন করে বললেন, সেটা আর এটা 'এক' হল?

ভেবে দেখলে 'একই'। 'ভয় আর লজ্জা' এই দুইয়ের সন্তানই

তো লুকোচুরি। ওটুকুও তো শুভ লক্ষণ গো। তবু ভয় লজ্জা আছে।

চমৎকার!

তোমার থিয়োরি নিয়ে তুমি থাকো। আমি তোমায় বুঝে নিয়েছি।

এই সেরেছে। আমায় বুঝে নিয়েছ? বল কী? কী বুঝেছ?

যা সত্যি, তাই বুঝেছি। চিরটাকাল তুমি হচ্ছ আমার বিরোধী পক্ষ।

জ্ঞানদৃষ্টিটা তাহলে খুলেছে?

নীহারকণা একটু হাসলেন, তবে খুলতে এতদিন লাগল?

শুয়ে পড়লেন।

এখন কথায় কথায় বলতে হবে মতিচ্ছন্ন হয়েছে লোকটার। এছাড়া—উপায় কী। মানটা তো রাখতে হবে। নিজের এবং ওই মতিচ্ছন্ন হয়ে যাওয়া লোকটার।

কিন্তু একথা কি ভেবেছিলেন নীহারকণা মতিচ্ছন্নের মাত্রা, মাত্রা ছাড়াবে?

লাল লাল মুখে এসে দাঁড়াল শ্রেয়া, মা, বাবা মাষ্টার মশাই-দের বাড়ি ছাড়বার নোটিশ দিয়েছেন?

চমকে উঠলেন নীহারকণা।

আর ইচ্ছে হল, চেঁচিয়ে বলে ওঠেন, তা' আমায় বলতে এসেছ কেন? সব কথা আমায় কেন? আসামীর সামনে গিয়ে বলতে পার না?

কিন্তু তা'তো আর বলা যায় না। তাই বলে উঠতে হল, কী বলছ বৌমা। এ আবার একটা কথা নাকি?

দীপুকে জিগ্যেস করুন। অবশ্য আপনার মত এতো অবাক আমি হচ্ছি না। সেই গেটের চাবির ব্যাপার থেকে বুঝেছিলাম এ রকম কিছু একটা হবে।

চলে গেল সামনে থেকে। অবহেলার ভঙ্গীতে।

নীহারকণা সেই চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে দেখলেন।

সহনশীলতারও তো কোনো একটা সীমা থাকবে?

নীহারকণার হাত পা থরথর করে উঠল, বুকের মধ্যেটা কে যেন খামচে ধরেছে।

চেঁচিয়ে ডাকলেন, দীপু! দীপু!

জানা যাচ্ছে বাড়িতে আছে।

সিগারেটের সৌরভ দীপুর উপস্থিতি জানান দেয়। বোধহয় ঘরে কবিতা লিখছিল।

সিগারেট অবশ্য ফেলে দিয়ে এল, তবে সৌরভটা বয়ে আনল। নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল। তার মুখটাও স্বভাবছাড়া গম্ভীর লালচে।

নীহারকণাও স্বভাবছাড়া চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, তোদের বাবা সমরবাবুকে বাড়ি ছাড়বার নোটিশ দিয়েছে?

দীপু ভুরুটা কুঁচকে অবহেলার গলায় বলল, কেন? দিয়েছে কিনা তুমি জানো না?

আমি? আমি জেনেশুনে তোকে জিগ্যেস করছি?

দীপু হাত ওল্টাল।

বলল—তা কী জানি। তোমার পারমিশান ছাড়া বাবা কিছু করতে পারে, এটা তো ভাবার বাইরে।

তার মানে সময় বিশেষে প্রজাপতিও কামড় দিতে পারে।

নীহারকণার মনে হল, শুনতে পাই কত লোকের ভয়ানক কোন মানসিক উত্তেজনায় স্ট্রোক্ হয়ে যায়। সেই ভয়ানকটা কোন স্তরের?

না কি নীহারকণা নামের মানুষটাই পাথর দিয়ে তৈরী? সাধারণ মানুষের শরীর যন্ত্রের সঙ্গে মেলে না তার স্নায়ু শিরা হৃদযন্ত্র!

পাথর দিয়েই যখন তৈরী তখন গলার স্বরটাও পাথুরেই হোক। বললেন, ডাক তোর বাপকে।

আমার কী দরকার?

কেন? কেন দরকার নেই? বল, কেন সব দরকার আমার। ডাক এখানে সকলের সামনে।

আমার দ্বারা হবে না।

বলে চলে যাচ্ছিল দীপু, ডাকতে হল না। দেবীপদ নিজেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, বললেন হয়েছেটা কী? চেঁচামেচিটা কিসের?

দীপু চলে যেতে চেষ্টা কোরো না, দাঁড়াও। নীহারকণা পাথর চোখেই তাকালেন স্বামীর দিকে। বললেন, তুমি সমরবাবুকে বাড়ি ছেড়ে দেবার নোটিশ দিয়েছ?

যদিও দেবীপদ খুব বীরের মতই এগিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু এখন ভেতরে তেমন জোরালো জোর খুঁজে পেলেন না। কারণ নোটিশটা দিয়ে পর্যন্ত বেশ একটু ভয় ভয় করছিল। বিবেকও কামড় দিচ্ছিল। এখন নীহারকণার এই পাথুরে প্রশ্নে সাহসের জোর আর একটু কমল।

তাই যে ভাবে চোটপাট উত্তর দেবেন ভেবেছিলেন, সে রকমটা হয়ে উঠল না। ভেবে তো ছিলেন, বলবেন, আমার খুশী। আমার বাড়ি, আমি যা ইচ্ছে করব। হল না। নিজের দিকের পাল্লায় শেষ বাটখারাটাই আগে চাপিয়ে ফেললেন।

রাগের গলায় বলে উঠলেন, দেব না তো কি বাড়িতে যা ইচ্ছে চালাতে দেব? সমরবাবুর লক্কা ভাইটি আমার মেয়েদের নিয়ে লারে লাপ্পা করে সিনেমা দেখতে যাবে, আর আমি মুখ বুজে সহ্য করবো?

সিনেমা যাওয়াটা অবশ্য খুব একটা আচমকা কথা নয়। দ্যাওরের ছুটি টুটি থাকলেই মনীষা দলবল জুটিয়ে তাকে সঙ্গী করে বেরিয়ে

পড়ে। এটা মনীষার একটা 'হবি'। মাঝে মাঝে নীহারকণাকেও ধরপাকড় করে ; তিনি অবশ্য রাজী হন না।

আর শ্রেয়ার সিনেমা দেখলে মাথা ধরে, তাই যায় না। তবে বুলি টুলি তো যাবেই। অলিখিত আইনের বলেই মনীষা, তাদের না জানিয়েই তাদের টিকিট কেনে। বেশীর ভাগই ম্যাটিনী শো। তবে বুলির ক্লাশ বুঝে।

নীহারকণা একটু থমকালেন, মনীষা কী যায়নি আজকে? শুধু নীহারকণার মেয়েরা আর সমরবাবুর ভাই?

স্থির স্বরে বললেন, শুধু তোমার মেয়েরা গিয়েছিল? মনীষা যায়নি?

গিয়েছিল, তাতে আমার কী? তার নিজের ভাজ ভাইঝি গুষ্ঠি-বর্গ সবাই যাক না। আমার মেয়েরা কেন যাবে? পাড়ার একটা বখা ছেলের সঙ্গে?

দীপু প্রায় গর্জন করে উঠল,

বাবা! তুমি ভ্রমরের সম্বন্ধে ভালভাবে কথা বলবে।

ওঃ! তোমার কাছে কথা বলতে শিখতে হবে?

দরকার হলেই হবে।

নীহারকণা স্বামীর দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে কড়াগলায় বললেন, যা তা বললেই যা তা শুনতে হয়। দল বেঁধে সবাই মিলে গিয়েছিল, তাতে হয়েছেটা কি? এমন যায় না লোকে? তার জন্যে তুমি বাড়ি ছাড়বার নোটিশ দেবে?

দেবীপদ আবার উষ্ণ হচ্ছিলেন, গলা চড়ালেন। বললেন, হ্যাঁ দেব। বাড়িতে কালসাপ পুষে রাখব না কি?

কালসাপ? হোয়াই?

দীপুর আরো কড়া গলা, পৃথিবীতে কিছুকাল আগে এসেছ বলেই ভাব যাকে যা খুশী বলবার অধিকার আছে?

দেবীপদ কি কোণঠাসা হয়ে যাবেন? হেরে গিয়ে চুপ করে

যাবেন? আগে তো তাই করে এসেছেন। কিন্তু এখন দেবীপদ কর্তার ভূমিকা নিতে চান। বলাই চাটুয্যের সমতুল্য পয়সাওলা না হতে পারেন, ছেলে মেয়েদের 'ফরেনে' পাঠাতে না পারেন, গিন্নীর জন্যে স্পেশাল একখানা গাড়ি উৎসর্গ করে রাখতে না পারেন, আফটার অল, তিনি বাড়ির কর্তা তো বটে। সেই অধিকারটাই বা তারিয়ে তারিয়ে ভোগ করবেন না কেন?

'বলাই চাটুয্যে' না হোন তিনি, তাঁর পক্ষে কসুরই বা কী করছেন। খেতে পরতে দিয়েছেন, ভাল ভাবে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, এই বেকার কবি বসে বসে লম্বা লম্বা কবিতা লিখছেন, আর লম্বা লম্বা কথা কইছেন। একটা কথা বলেন দেবীপদ? এর ওপর আবার চোখ রাঙানী?

সকলের মান আছে, মান নেই শুধু হতভাগা কর্তার?

জোর গলায় বললেন, তা' কালসাপ ছাড়া আর কী? যে অনিষ্ট করতে আসবে তাকেই সাপ বলব। আজ দল জুটিয়ে যাচ্ছে, কাল একা দুজনে জুটি হয়ে যাবে।

হঠাৎ ভয়ানক একটা ঘটনা ঘটে গেল। দেবীপদ কি স্বপ্নেও ভেবেছিলেন সহসা একটা বোমা ছুঁড়ে মারবেন নীহারকণা?

আর নীহারকণা?

তিনি নিজেই কি জানতেন সেটা?

মুহূর্ত আগেও কী ভেবেছিলেন, আচমকা এই বোমাটা ফাটাবেন তিনি?

ছোরাছুরি নয় যে কেবলমাত্র লক্ষ্য ব্যক্তিটিকেই মারবে। বোমা এমনই জিনিষ, যে যে মরবার সে তো মরবেই আশপাশেররাও তো ধাক্কা খাবে।

এখনো তাই হল।

নীহারকণার ফাটানো বোমার ঘায়ে যেন একটা ভূমিকম্প ঘটে গেল।

দীপু নামের ছেলেটা পর্যন্ত চমকে উঠে বলল, কী? কী বললে?

অতএব ঘরের মধ্যে থেকে শ্রেয়াও, 'কী'—বলে ছিটকে বেরিয়ে আসবে এ আর আশ্চর্য কী? আশ্চর্য কি যে বুলি নামের মেয়েটা সামনে দাঁড়িয়ে থাকা টুলিকে দু হাতে প্রায় খিমচে ধরবে।

কারণ নীহারকণার বোমার শব্দটা ছিল এই, তাই যদি যায়, দোষটা কী? দুদিন বাদে যখন দু জনের বিয়েই হচ্ছে।

ব্রহ্মাস্ত্র!

তা তেমন বিপদে পড়লে লোকে দিশেহারা হয়ে ব্রহ্মাস্ত্রটাই মেরে বসে বৈকি।

সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার হঠাৎ নিভে যাওয়া অসহায় মুখটার দিকে তাকিয়ে মনটা করকরিয়ে উঠল নাকি? উঠল। তবু এটা কি মনে হল ওই কোণঠাসা হয়ে যাওয়া মানুষটাই নীহারকণার পায়ের তলার মাটি, মাথার ওপর ছাতা।…ওই বুদ্ধি-হীন একবগগা লোকটা।

তা তাই মনে করেছেন বলেই হয়তো অন্যের হাতে নিহত হতে দিতে পারছেন না।

আর এই ঘোষণাটা?

ভয়ঙ্কর একটা চমক দেওয়াই সন্দেহ নেই, তবু এও কি ঠিক নয় যে, নীহারকণা চেতনে অবচেতনে ওই অমোঘ পরিণতির জন্যেই প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

মায়ের চোখ বড় সাংঘাতিক। এক্সরে-আই স্রেফ, হাড়ের ভিতর পর্যন্ত দেখতে পায়। ওরা জানে, নিপাট সরলতায় ওরা যখন আর পাঁচজনের মাঝখানে সাধারণ হ'য়ে ঘোরে, অন্য কেউ ধরতেই পারে না, কে কার দিকে কোন চোখে তাকাল, কে কার সঙ্গে কোন দ্ব্যর্থ-পূর্ণ ভাষায় কথা কইল, সেটা আর কেউ বুঝতেই পারছেনা।

বুলির চোখের সামনে অন্ধকারের পর্দা, সেই পর্দাটা ভেদ করে

দেখবার চেষ্টা করছে বুলি, কবে কখন, অসতর্কতায় মার চোখের সামনে তার গভীরতম হৃদয়ের ছবি প্রকাশ হয়ে গিয়েছে।

কই? কবে?

যা ঘটেনি, তা ভেবে খুঁজে পাবে কোথা থেকে?

বুলি তাই ঘরে বসে কাঁপতে থাকে।

দেবীপদর চোখের দৃষ্টিতে ধূসর অসহায়তা।

যন্ত্রের মত নীহারকণার ঘোষণাটাই উচ্চারণ করলেন, 'দু' দিন বাদে যখন দুজনের বিয়ে হচ্ছে!'

নীহারকণা এখন শক্ত ভূমিতে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। জেনে ফেলেছেন নীহারকণাকে কেউ আঙুল তুলে বলতে আসবে না, 'এটা তুমি কোন্ সাহসে বললে?'

একজনমাত্র বাদে সংসারের সকল সদস্যের কাছেই এটা আনন্দের সংবাদ। নিশ্চিন্ততার সংবাদ।

এই খবর ঘোষিত হওয়ার পর দীপু পরম প্রসন্নতায় বলবে, নাঃ! মাদারের বুদ্ধি হ্যাজ! সাহস হ্যাজ!

বুলি নামের মেয়েটা কৃতজ্ঞতায় গলে গিয়ে মায়ের কাছে নম্র হয়ে যাবে, আনত হয়ে যাবে।

নীপু বলবে, আরে, তাইতো সমস্যা সমাধানের এমন একটা পথ খোলা ছিল। খেয়াল হয়নি তো!

এমন কি শ্রেয়াও প্রসন্ন হয়ে যাবে। কারণ এটা তার অনুকূলে যাচ্ছে।

আর?

বিস্ময়ে বিমূঢ় মনীষা আর তার বর বলবে, মাসিমা আপনি কী উদার, কী মহৎ। আপনার ঋণ শোধ করবার নয়।

ওরা কি ভ্রমরের মন বুঝতে পারছিল না? আর ভাবছিল না—হায়! বোকা ছেলেটা আকাশের চাঁদের দিকে তাকিয়ে বসেছে।...

তার মানে সবদিক শান্ত শীতল আর স্নিগ্ধ বাতাসে ভরে উঠবে।

দুটো পরিচিত পরিবারের মধ্যে স্বার্থের আর হিংস্রতার বিষ ক্লেদাক্ত করে তুলতে পারবে না।

নীহারকণার বোমাটাই এতটা সুফলপ্রদ।

অনেক ক্ষণ পরে।

দেবীপদ বললেন, ওই কারখানার কুলিটার সঙ্গে বুলির বিয়ের কথা ভাবতে পারছ তুমি?

নীহারকণা বললেন, ভাববার মালিক কী আমি? তা দেখো এখন, উচ্ছেদের নোটিশটা তুলে নেবে কি লড়াইয়ে নামবে। বলবেন না কেন, বিরোধী পক্ষ তো।

কিন্তু এছাড়া আর কী উপায় ছিল সবদিক বজায় রাখবার? আর এই বজায় রাখা ছাড়া নীহারকণার কি নিজস্ব কোনো জীবন আছে? না কোনোদিন সেটা চাইবার দুঃসাহস করেছেন? জানেন তো চাইতে গেলেই দেবীপদর মত হাস্যস্পদ হতে হবে।

এযুগের এটাই আইন। আর আইন না মেনে উপায় কী? শুধু শক্তি যায় বৈ তো নয়।

স্মৃতি সত্তা জীবন

ডুব সাঁতার দেওয়া মানুষের মাথাটাকে যেমন হঠাৎ হঠাৎ এক একবার জলের উপর ভেসে উঠতে দেখা যায়, প্রায় তেমনি ভাবেই একটা রুক্ষচুলো মাথাকে এই নতুন ঘরের পিছনের মেঠো জমির দিকের জানলাটার নীচে থেকে বেশ কয়েকবার ভেসে ভেসে উঠতে দেখা যাচ্ছিল। চোখটা তুলেছে কি তোলেনি, অমনি টুপ।

তার মানে বারে বারে উঁকি মেরে মেরে দেখছে ঘরের মধ্যে যে বাবুটা কিছু কাজ না করেও ঘুরঘুর করছে, সে ঘর থেকে বিদেয় হয়েছে কি না। বিদেয় হবারই তো কথা, ঘরটায় তো বসবার মত কিছু নেই, একটা টুল পর্যন্ত না। সবে কাল রং হয়েছে দেওয়ালে, হাল্কা আকাশী রং। অম্লানকুসুম দোতলা থেকে নেমে এসে, দেওয়ালে আঙুল ঘষে ঘষে দেখছিলেন, রংটা আঙুলে উঠে টুঠে আসছে কিনা। কতক্ষণ আর দেখে মানুষ এসব ?

এই ঘরটাই অম্লানকুসুম নীচের তলায় নিজের 'বৈঠকখানা' হিসেবে বানিয়েছেন। দোতলায় সিঁড়িতে উঠেই যে 'হল' প্যাটার্নের টানা লম্বা ঘরখানা, সেটা শিপ্রার এবং তার ছেলে মেয়েদের ড্রইংরুম। ···মাতাকন্যার সমবেত চেষ্টায় সে ঘর ইতিমধ্যেই দিব্যি সাজানো গোছানো হয়ে গেছে। মোটামুটি সব ঘরই গুছিয়ে নিয়েছে শিপ্রা, শুধু অম্লানকুসুমের 'নিজস্ব' এই ঘরখানাই এখনো পর্যন্ত ন্যাড়া পড়েছিল। কারণ ঘরের রং নিয়ে কর্তা গিন্নী এবং ছেলে-মেয়েদের মধ্যে হাল্কা মতবিরোধ চলছিল। ···অম্লানকুসুম যে ওই ঘরখানাকে বৈঠকখানা' আখ্যা দিচ্ছেন এটা নিয়েই তো ওদের হাসির শেষ নেই, তার ওপর আবার তাঁর মত, 'আমার ওই ঘরটা শুধু চূণকাম করা থাক না।' ···হোয়াইট ওয়াশ নয়, চূণকাম।' এতেও যদি ওরা না হাসবে, তো কিসে হাসবে ?

তা'ছাড়া—'শাদা ধপধপে দেওয়াল দেখলে বেশ নতুন বাড়ি নতুন বাড়ি ভাব আসে' এ আবার কী গ্রাম্য ছেলেমানুষী? ...সারা বাড়িতে ডিসটেম্পার, ড্রইংরুমটায় তো 'প্লাস্টিক-পেণ্ট' আর তার মধ্যে একখানা ঘর কিনা বিধবার মত শাদা? ...তা'ও যে ঘরে বাইরের লোকজন, বা অম্লানকুসুমের বন্ধুজন এসে বসবে টসবে! অচল অচল।...

অনেক বাক্যাবলীর পর রফা হয়েছে, ওই হাল্কা আকাশী নীলে। ...সারাজীবন তো চাকরীর সূত্রে সাতঘাটের জল খেয়ে বেড়িয়েছেন অম্লানকুসুম, কিন্তু মনের মধ্যে শৈশব বাল্যের পরিবেশের স্মৃতিটিই লালন করে এসেছেন। ....'রিটায়ার করে যদি কখনো বাড়ি করে স্থায়ী হয়ে কোথাও বসতে পারি তো ঠিক আমাদের জঙ্গীপুরের সেই বাড়িটার মত বাড়ি বানাব।'

জমি কেনার পর অম্লানকুসুম মানসিক সেই প্ল্যানটি যখন পেশ করলেন, স্ত্রীপুত্রকন্যার কাছে তখন ওঁর মাথার সুস্থতা নিয়ে সন্দেহ করতে লাগল ওরা। ...জমি না হয় কেনা হয়েছে অনেকখানিটা, তাই বলে এলোমেলোভাবে অপচয় করে সেই জমিটায় একখানা মান্ধাতার আমলের প্ল্যানে বাড়ি বানাবে তুমি? পাগল না কি?

লোকটা যে এতাবৎকাল একটি সরকারি উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত থেকে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে এসেছে, এবং সসম্ভ্রম গৌরবেই বিদায় নিয়েছে, সে কথা এখন আর কারো মনে পড়ে না।...আর এও মনে পড়ে না এই বিপুল পরিমাণ টাকাটা ওই লোকটারই উপার্জিত। বরং ওদের মনোভাব, যেন একটা অবোধ শিশুর হাতে খুব দামী একটা খেলনা এসে গেছে। বোকাটা সেটা হাতে পেয়ে ভেঙে ফেলে না কী করে। অতএব ওর হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ঘর সাজাতে তুলে রাখো বাবা।

তা লোকটা এক হিসেবে বোকা বৈকি। একবারও তো ওদের ভুলে যাওয়া কথাটা মনে পড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে না। ...ওই যে

একখানা ঘর নিয়ে নিজের একটু শখ প্রকাশ করেছে—সেও যেন কুণ্ঠিত হয়ে…

অপচয় চলবে না। আধখানা জমি কেটে রাখা হয়েছে ভবিষ্যতের দাঁওয়ের আশায়। হয় কিছুকাল পরে চারগুণ দামে বেচা হবে, নয়, ওর উপর পাঁচতলা বিলডিং বানিয়ে ফ্ল্যাট ভাড়া দিয়ে দশগুণ তোলা হবে। এই পরিকল্পনা।

অম্লানকুসুম বলেছেন, তোমাদের এসব 'পরীর কল্পনা।' ওরা নজির দেখিয়ে নিজেদের পক্ষ স্ট্রং করেছে।

তা' যা হয় হোক, নীচের তলার ওই একটা ঘর আমার শখ মত করব বাপু।

তোমার শখ?…মেয়ে হি হি করে হেসেছে। তোমার শখ তো 'চুণকাম' করা দেওয়াল, সাবেকি প্যাটার্নের শার্সি খড়খড়ি দেওয়া জানলা, লাল রঙা সিমেণ্টের মেজে।

কথাটা সত্যিই তাই।

বাড়ি বানাবার প্রথম পর্ব থেকে নিজের ইচ্ছে ছাঁটতে ছাঁটতে, শেষমেশ ওই একখানি ঘরের বাসনায় এসে ঠেকেছিল। …এই ঘরখানার মেজে লাল সিমেণ্টের, জানলাগুলো শার্সি খড়খড়ির, দেওয়ালের গায়ে সাবেকি ধরনের দেওয়াল আলমারি। শুধু দেওয়ালটাকে কিছুতেই 'খাঁ খাঁ করা শাদা' রাখতে পাননি। ওটা না কি বড্ড সেকেলে আর হতভাগা মত।

আচ্ছা সাদা ধপধপে দেওয়ালের সুবিধেটাও ভাব? একটু ময়লা হলো, দুটো মিস্ত্রী ডেকে একদিনে আবার ফর্সা করে ফেলা গেল, কিন্তু তোদের রঙের দেওয়ালের কত ঝঞ্ঝাট। ঘষো, রং তোলো, তিনদিন সময় লাগাও।

শিপ্রা হেসে হেসে বলেছিল, 'ভাতে ভাত' খাওয়ার দেখো কত সুবিধে। চালের মধ্যে চারটি আনাজপাতি ছেড়ে দিলে, হয়ে গেল

খাওয়া। তবু পঞ্চাশ রকম রান্নাটি তো হয়। খেতেও মন্দ লাগে না মশাই? না কি লাগে?

ঠিক আছে।

অম্লানকুসুম মনে মনে ঠিক করে রেখেছেন, ঘরটাকে তিনি ঠিক জঙ্গীপুরের সেই বৈঠকখানাটার মত করে সাজাবেন।

ঘরের পিছনে ওই ছাড়া জমিটুকু থেকে একরকম ভাল হয়েছে। জঙ্গীপুরেও বাবা জ্যাঠামশাইয়ের বৈঠকখানা ঘরের পিছনে ওই রকম খানিকটা ছাড়া জমি ছিল। অম্লানকুসুম, আর তাঁর জ্যাঠতুতো দাদা ফুল্লকুসুম জানলায় উঁকি মেরে মেরে ওঁদের দাবাখেলা, পাশাখেলা এবং দহরম মহরম দেখতেন।....আর নিজেরা বলাবলি করতেন, বড় হয়ে যাওয়ার কী মজা! যত ইচ্ছে খেলো। লেখাপড়া করতে হয় না। বাবা ছিলেন জঙ্গীপুর কোর্টের উকিল, আর জ্যাঠামশাই, এল. এম. এস. ডাক্তার। দুই ভায়ের দাপটে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেতো।

তাঁরা রাস্তায় বেরোলে সবাই সন্ত্রস্ত। অপর বাড়ির ছেলে কে কার সঙ্গে ঝগড়া মারামারি করছে ওঁরা হাঁক পাড়লেন, কে র‍্যা। কাদের বাড়ির ছেলে তোরা? ···অ্যাঁ অমুক বাড়ির? ছোটলোকের মতন রাস্তায় দাঁড়িয়ে কোঁজিয়ে করছিস? আয় তো কাছে, এক থাপ্পড় লাগাই!···

কাছে অবশ্য আসতো না তারা। পিটটান দিতো। তবে শায়েস্তা হয়ে যেত। শায়েস্তার দায়িত্ব অন্যদের ছিল। ওই বৈঠকখানাটা সকালের দিকে মোটামুটি একটা কাছারি ঘরই হয়ে উঠতো। ···অম্লানকুসুমের বাবা, গ্রামের অনেকের অনেক 'নালিশ' ওইখানে বসেই নিষ্পত্তি করে দিতেন।···কে কার বুড়ো বাপকে খেতে দেয় না, কে কার বিধবা বোনকে একপাল ছানাপোনা সমেত ঘাড়ে নিতে নারাজ, কে ঘরে একটা বিয়ে করা পরিবার থাকতে, রাগ

ঝগড়ার মাথায় দুম করে আর একটা বিয়ে করে ব'সেছে, এ সবের শাসন উকিল গহনকুসুম মল্লিকের কাছে।

বাবা যখন বাজখাঁই গলায় বলতেন, আজ তুই ব্যাটা বুড়ো বাপকে ভাত দিচ্ছিস না, খেয়াল রাখিসনা তুইও একদিন বুড়ো হবি, আর তোর ঘরেও তোর ব্যাটারা রয়েছে। বলি কী দৃষ্টান্ত দেখছে তারা? অ্যাঁ, কী দেখছে?···তবে, ভবিষ্যতে কী শিখবে?

বলি বিধবা বোন বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে ভেসে বেড়ালে তোর মুখ খুব উজ্জ্বল হবে হতভাগা?···ধর্ম নেই, সমাজ নেই, লোকলজ্জা নেই। ···ভাগনা ভাগনীগুলো এর ওর তার দোরে গিয়ে মানুষ হবে? অ্যাঁ? চোখের চামড়া নেই? বলি, আজ যদি তুই পটল তুলিস? তোর শালারা এসে দেখবে না তোর সংসার?···

যে লোক আর একটা বিয়ে করে বসেছে তাকে অনায়াসে শাসাতেন, তোকে আমি পুলিশে দেব হারামজাদা নচ্ছার। রাগ হল, আর মেজাজ দেখিয়ে আর একটা বিয়ে করে বসলি। লক্ষ্মী-ছাড়া পাজী।···

কাউকে কোনোদিন বলতে শোনা যেত না, আমার সংসারের ব্যাপারে আপনার মাথাব্যথা কেন বাবু।

সর্বনাশ? ভাবাই যেত না।

কাজেই ওই বৈঠকখানা ঘরটি বাড়ির ছোট ছেলেদের কাছে একটি মহিমান্বিত রাজদরবার তুল্য ছিল।

সেই ঘরটির সাজসজ্জাও সমস্ত মনে আছে অম্লানকুসুমের। মাঝখানে একখানি মস্ত চৌকীর উপর শাদা চাদর পাতা ফরাস, তার উপর ছোট ছোট তাকিয়া রাখা থাকতো। ঘরের তিনদিকে দেওয়াল ধারে কাঠের বেঞ্চ পাতা, যত রকম আছে বাজে লোক এসে হাজির হতো তাদের জন্যে ওইগুলো।···দেওয়ালে খুব উঁচুতে চওড়া চওড়া ফ্রেমে বাঁধানো নানা দেবদেবীর ছবি টাঙানো। তার নীচে চার দেওয়ালে চারটে 'দেওয়ালগিরি।' চিমনির কাঁচগুলো প্রতিদিন

এতো পরিস্কার করে সাফ করা হতো যে কেরোসিনের শিখাগুলোয় ঘরের শাদা দেওয়ালগুলো যেন দিনের আলোর দেওয়ালের মত লাগতো।···আর হঠাৎ বাড়িতে কোনো বাড়তি লোক এসে পড়লে, ওই ফরাসটার ওপরই গড়িয়ে শুয়ে পড়ত। কোথায় তাদের শুতে দিতে হবে ভাবতে হতো না। এই ঘরটিকে ঠিক সেই ভাবে সাজাবার ইচ্ছাটি মনের গভীরে লালন করে আসছেন অম্লানকুসুম। ···শুধু ওই আলোগুলোকে কেরোসিনের করা যাবে না।··· দেওয়ালে দেওয়ালে বিদ্যুতের আলোই রাখতে হবে।....তবে? মনে মনে হেসেছেন অম্লানকুসুম। তোদের কলকাতার তো আজকাল বিদ্যুতের সঙ্গে কেরোসিনের সহাবস্থান।···

ঘরসাজানোর এই পরিকল্পনাটি এখনো বাড়ির লোকের কাছে প্রকাশ করেননি অম্লানকুসুম। শুধু মস্ত একখানা চৌকী বানাতে দিয়ে রেখেছেন, গোল গোল পায়া, পালিশ করা গা।

শিপ্রা কেবলি বলে, তোমার ঘরের জন্যে কী ধরনের সোফাসেট করাতে দেব, পষ্ট করে বলছ না কেন? বেতের টেতের না কি?

অম্লানকুসুম বলেন, হবে হবে তাড়া কি?

অতএব ঘরটা এখন পুরো খালি।

জানলার বাইরেটায় এই নীচে বাড়ি তৈরীর উদ্বৃত্ত কিছু বাজে মাল জমিয়ে ফেলে রাখা হয়েছে। যেমন বাঁশ দড়ি, মশলামাখা আঙটাহীন লোহার কড়াই। তাছাড়া ভাঙা ইঁট-পাটকেল তো আছেই।···ওই আলাই বালাই গুলোর উপর পা রেখেই কোনো বীরপুরুষ ডুব সাঁতার খেলা খেলছে।

এ রকম ক্ষেত্রে তারা পাঁচজনে কী করে? 'একবার মাথাটা দেখতে পেলেই আওয়াজ তুলতো। কে র‍্যা? কে ওখানে?

আর হাঁকটা শুনলেই লোকটা শ্যাওলাধরা বাঁশের বোঝার উপর থেকে পিছনে নেমে দৌড় দিতো।

কিন্তু অম্লানকুসুম তা করলেন না। অম্লানকুসুমের মনোভঙ্গী বিচিত্র। একবার ওই মাথাটা চোখে পড়ামাত্রই অম্লানকুসুম একেবারে অন্যমনস্ক হয়ে যাবার ভান করে দেওয়াল আলমারির কাঁচের গায়ে আঙ্গুল ঘষে ঘষে যেন ধুলো তুলতে লাগলেন। যদিও কাঁচের মধ্যে থেকে দেখতে পাচ্ছেন লোকটা বারবার মাথাটা ভাসিয়ে তুলছে আর টুপ করে নামিয়ে নিচ্ছে।

লোকটা মনে মনে আমায় যা গাল দিচ্ছে।······অম্লানকুসুম একটু কৌতুকের হাসি চাপলেন।... ...অম্লানকুসুমের হঠাৎ নিজের ছোট বেলায় সেই দৃশ্যটার কথা মনে পড়ে গেল। জ্যাঠতুতো দাদা ফুল্লকুসুম বা ফুলু আর তিনি, তখন যাকে অমু বলে ডাকা হতো, ওইভাবে বৈঠকখানা ঘরের পিছনের জানালা থেকে উ'কি মেরে মেরে দেখতেন। না, শুধুই বাবা-জ্যেঠামশাইয়ের দাবাপাশা খেলা নয়। বাবার দরবার দৃশ্যটাও।······

যখনি কেউ বাবার কাছে দাবড়ানি খেতো, আহ্লাদে আবেগে চোখে প্রায় জল এসে যেতো অম্লানকুসুমের।······

এখন একবার নিজের পরিবেশটা দেখে নিলেন অম্লানকুসুম।

পিছনের এই জানলাটা ছাড়াও, সামনের এক কপাট-খোলা দরজাটা দিয়েও বাইরের দৃশ্যটা চোখে পড়ে।

শহর তার বিশাল দুই ভুজ বিস্তার করতে করতে গ্রাস করে চলেছে, উত্তর-দক্ষিণের প্রান্তসীমা।........পূব দিকটাতেও ল্যাজের ঝাপটা দিয়ে দিয়ে এগিয়ে চলেছে। এসবই এখন 'বৃহত্তর কলিকাতা' গোছের একটা নামের মর্যাদা পাচ্ছে।······

অম্লানকুসুম যেখানে জমি কিনেছেন সেখানটা এই কিছুদিন আগেও নেহাৎ গণ্ডগ্রাম বলে গণ্য ছিল।

খানিকটা দূরে দূরে এবড়ো-খেবড়ো আধকাঁচা 'বড়রাস্তা' দিয়ে বাসরুট হওয়া অবধি, যেন শতবছরের ঘুমন্ত পরিবেশকে খোঁচা মেরে জাগিয়ে তুলে তুলে, নিশ্চিন্ততার শান্তিকে হরণ করে নিয়েছে।....তবু

এখনো যেখানে সেখানে পল্লবঘন আম্রকাননের আভাস দেখা যায়। হয়তো বা আম্রকানন নয়, নয় কাঁঠাল গাছের ভারী পাতার ছায়া, তবু ঘন সবুজের সমারোহ চোখে পড়ে। চোখে পড়ে ওরই ফাঁকে ফাঁকে মাটির কুঁড়ে, ডোবা পুকুর, গ্রামের মেয়েদের অভ্যস্ত ভঙ্গীতে পুকুরপাড়ে বসে বাসনমাজার দৃশ্য। চোখে পড়ে গরু চরার দৃশ্য। জীর্ণশীর্ণ কোন বুড়ির ডোবার ধার থেকে শাকপাতা খুঁটে তোলার অধ্যবসায়ের ছবি। আর এই পরিবেশের গায়ে গায়ে হঠাৎ হঠাৎ এক একখানা অতি আধুনিক ছাঁদের ছবির মত বাড়ি।······যেন বেমানানের প্রতীক হিসেবে অকস্মাৎ গজিয়ে উঠেছে। অতি সুদৃশ্য গ্রীলের গেট-এর সামনেই পাটাতন চাপা কাঁচা নর্দমা সুদীর্ঘ কালের পাঁকের সঞ্চয় নিয়ে প্রবাহিত। তারই সামনে রাস্তার আকৃতিহীন রাস্তা। ঢিল পাটকেল ছড়ানো জায়গায় জায়গায় ঘাস গজানো খোলা জমিটাই এই নতুন গড়ে ওঠা পাড়ার রাস্তা। তবু এর মধ্যেই ছবি ছবি বাড়িগুলোর গ্যারেজে গাড়ি, হাফপ্যান্ট গুটনো একটা স্থানীয় ছোকরা বাড়ি বাড়ি গাড়ি ধুয়ে বেড়ায়।

অম্লানকুসুমের গাড়ি নেই।

স্ত্রী পুত্রের আক্ষেপেরও শেষ নেই।

ওরা আগে থেকে ভেবে রেখেছিল, 'কর্মমুক্তির' মূল্যবাবদ টাকাগুলো পাওয়া গেলেই বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডে অথবা গলফ্‌ক্লাব রোড কমপ্লেক্সে একখানা ফ্ল্যাট কিনে ফেলা হবে, একখানা গাড়িও। তারপর যা হয়। সরকারি চাকরী, পেনশানতো থাকবেই, আর ছেলে সব্যসাচী ততদিনে সি. এ. পাশ করে বেরোবে। অভিমন্যুও খড়্গপুর থেকে বেরিয়ে আসবে কিছুদিন পরেই। তখন আর শিপ্রাকে পায় কে?

বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডে শিপ্রার মাসতুতো দিদি জামাইবাবু থাকেন। তাঁরা একটা ফ্ল্যাটের আশ্বাসও দিয়েছিলেন তাঁদের গায়ে গায়ে। তিন-ঘরা ফ্ল্যাট, অতি আধুনিক সুখ সুবিধে-যুক্ত, মাত্র

একলাখ আশী হাজার টাকা দক্ষিণা। তাও সবটা একসঙ্গে দিতে হচ্ছে না।······দারুণ ঝুঁকেছিল শিপ্রা আর তার ছেলেমেয়েরা।······আহা! লতুমাসির বাড়ির মত একটা বাড়ি তাদেরও হবে।······ভাবলে আহ্লাদে চোখে জল আসে।

কিন্তু ব্যাপারটা এগোল না।

লতু আর তাঁর স্বামী, হঠাৎ আমেরিকায় চলে গেলেন মেয়ে-জামাইয়ের কাছে। লতুমাসীর ছেলেবৌ এদের তেমন পছন্দ না। ···এরা জানেও না কোথায় কলকাঠি নাড়লে ছ'তলার উপর একখানা তিন-ঘরা ফ্ল্যাট জোগাড় করে ফেলা সম্ভব, মাত্র একলক্ষ আশী হাজার টাকায়।

অম্লানকুসুম বললেন, মানলাম লিফট আছে, কিন্তু হরদম তো লোড্‌শেডিং। কে উঠবে ছ'তলায়? তা ছাড়া—তিনটে মাত্র ঘরে কী ভাবে ম্যানেজ করা যাবে? দুই ছেলে, ভবিষ্যতে দুই বৌও হবে। মেয়ের ভবিষ্যতেও জামাই। তাছাড়া নিজেরা।···ড্রইংরুম বলতে যা আছে তোমার লতুদির, সে ভাবে সাজিয়ে রাখলে সেখানে কারো শোওয়ার প্রশ্ন নেই।...আর লতুদির মত সাজাতে না পারলে ড্রইংরুমেরই বা দরকার কী?

কী ভাগ্যি শিপ্রা এই কথাগুলোর যৌক্তিকতা অস্বীকার করতে পারল না।···বিশেষ করে লতুদির যাত্রা কালের কথাটা মনে বিঁধে থেকেছিল তো।···

ছ'তলা সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে হাঁটুতে আর্থ্রাইটিস জন্মে গেল রে শিপ্রা।···কিছুদিন অন্ততঃ স্বাতীর কাছে থেকে আসি। ওদের ওখানে আর যা আছে থাক, লোড্‌শেডিং তো নেই।

শিপ্রা নিজের হাঁটু সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল। তাই অগত্যা তিন-ঘরা ফ্ল্যাটের মোহ ত্যাগ করল।

ইত্যবসরে অম্লানকুসুম দালাল লাগিয়ে কলকাতার দক্ষিণাঞ্চলে, আশী হাজার টাকায় দশকাঠা জমি কিনে ফেলেছেন। প্ল্যান নিয়ে

দারুণ মাতামাতি চলল কিছুদিন, এবং অতঃপর স্ত্রী পুত্র কন্যা সকলেই মুখে না হোক মনেমনে স্বীকার না করে পারল না, অত টাকা দিয়ে ছ'তলায় ফ্ল্যাট কেনার থেকে এ অনেক ভাল হয়েছে। এখানে আপন আপন রুচি পছন্দ প্রকাশের স্কোপ আছে, পারিবারিক প্রয়োজন অনুসারে ঘরের সংখ্যা বাড়ানোর সুবিধে আছে, আর সর্বোপরি এখানে পায়ের তলায় মাটি আছে।···ছাড়া জমিটায় এখন বাগান করো, বাগান ; টেনিস কোর্ট করো, টেনিস কোর্ট। মোটা কাছি দিয়ে দোলনা বানিয়ে দুললেই বা ঠেকায় কে ?···

আর দোকান বাজার ?

কলকাতার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রভূমি গড়িয়াহাট কতখানিই বা দূর ? ···শুধু যদি গাড়িটা হয়ে উঠতো ! ···সে টাকা আপাতত এখন নেই।

অম্লানকুসুম কিছু কিঞ্চিৎ লজ্জিত। কারণ স্ত্রী পুত্র কন্যা সর্বদাই আক্ষেপ করছে, একটা গাড়ি না থাকলে জীবনের কোনো মানেই হয় না।

কে যে কোথায় জীবনের মানে খোঁজে !

অম্লানকুসুম নামের একটি প্রৌঢ় ব্যক্তি, যে নাকি তার সারা কর্মকাল সরকারি কর্মসূত্রে পাওয়া ভাল ভাল কোয়ার্টার্সে কাটিয়ে এল, সে কিনা এখন জীবনের মানে খুঁজছে শৈশব-বাল্যের একটু স্মৃতির ছায়ার মধ্যে।···

অম্লানকুসুম ভাবলেন, ওই মুণ্ডুর অধিকারীকে ধরতে হলে, ওর সামনে দিয়ে খোলা দরজার পথে বেরিয়ে গেলে চলবে না। বুঝতে পারলেই চম্পট দেবে।

অম্লানকুসুম তাই অন্যমনস্কতার ভান করে, বাড়ির ভিতর দিয়ে

দরজা দিয়ে ঢুকে এলেন।…এদিক থেকে ঘুরে ওই পিছনের ছাড়া জমিটায় গিয়ে পেঁছিলেন।…

দেখলেন সেই মুন্ডুর অধিকারী এখন মাথাটাকে ভাল করে উঁচিয়ে লোহার-গরাদে (হ্যাঁ এ ঘরটার জানলায় সাবেক কালের গরাদ লাগানো) গাল চেপে ভিতরটা যতদূর পর্যন্ত অবলোকন করা যায় তা' করবার চেষ্টা করছে।

একেবারে পিছনে পেঁছে এসে অম্লানকুসুম হঠাৎ জঙ্গীপুরের গহনকুসুম মল্লিকের গলায় হাঁক পাড়লেন, কে র‍্যা? কে ওখানে?

নিজের কণ্ঠস্বরে, নিজেই চমকে উঠলেন অম্লানকুসুম। অদ্ভুত একটা পুলক-রোমাঞ্চের স্বাদ অনুভব করলেন।…চাকরী জীবনে মাঝে মাঝে নিজের গলার আওয়াজ শুনতে পেতেন বটে, কারণ মফঃস্বল শহরে টহরে তখনো পিয়ন আর্দালি এদের মধ্যে 'বাম' স্পর্শ লাগেনি। বিশেষ করে বাংলার বাইরে।

কর্মজীবন সাঙ্গ হবার পর, কেবল মাত্র স্ত্রী পুত্র পরিবারের সঙ্গে কাটাতে কাটাতে জঙ্গীপুরের মল্লিক বাড়ির কন্ঠস্বরটা ভুলেই গিয়েছিলেন।

লোকটা চমকে মুখ ফেরাল।

আর অম্লানকুসুমও চমকালেন। ভেবেছিলেন, বুঝি একটা দুষ্টু ছেলে। আরে এ যে একটা ঝুনো পাকা করাটে মুখ। তার মানে ছেলেমানুষের কৌতূহলের উঁকিঝুঁকি নয়, বদমাইসের কোনো বদ অভিসন্ধি।

অম্লানকুসুমের মধ্যে গহনকুসুমের সত্তার আবির্ভাব ঘটে। ধমকের গলায় বলে ওঠেন, এখানে কী করছিস?

লোকটা বোধহয় ধারনা করতে পারেনি, যে বাবুটা ফর্সা ধুতি পাঞ্জাবী পরে, অলস ভাবে দেওয়ালের গায়ে আর আলমারির কাঁচে আঙুল ঘষে ঘষে দেখে বেড়াচ্ছিল, তার গলা থেকে এমন জমিদারী বজ্রনিনাদ বেরোতে পারে।

চুলগুলোয় তেলের অভাবের ছাপ স্পষ্ট, মুখটা হাড় বার করা, তবু চোখ দুটোয় 'ঘুঘুর' ছাপ। তা'হলেও লোকটা কাঁচু-মাচু মুখে বলল, আজ্ঞে একজনাকে খোঁজতেচি।

কী? কী বললে চাঁদ? একজনাকে খোঁজতেছো? আমার বাড়ির জানলায় উঁকি দিয়ে দিয়ে কোন জনাকে খুঁজতেছিস রে হতভাগা?

লোকটা বিনবিন করে বলে, আজ্ঞে 'লবঙ্গ' বলে একটা মেয়ে-ছেলেকে—

চোপরাও, ব্যাটা বদমাস। আমার বাড়ির জানলায় উঁকি দিয়ে তুমি 'মেয়েছেলে' খুঁজতেছো? অ্যাঁ! পাজী! লক্ষ্মীছাড়া!

অম্লানকুসুমের কণ্ঠস্বরটা কি বহুযুগের ওপার থেকে ভেসে আসছে? না কি এই স্বরটাই আর কারো?···কিন্তু ঘটনাটা বহু-যুগের ওপারের নয়, এপারের। তাই লোকটা ভীত ভাব ত্যাগ করে ঘাড় বাঁকিয়ে বলে ওঠে, খামোকা গালমন্দ করতেছেন ক্যানো বাবু? গরীব বলে কি মান-অপমান নাই।

ওরে বাপস!···অম্লানকুসুম বললেন, গালমন্দে বাবুর মানের চুড়ো খসে গেল। আর আমি যদি তুই চুরির মতলবে উঁকি ঝুঁকি মারছিলি বলে পুলিশে দিই?

লোকটার ঘুঘু চোখে ফস্ করে দুটো দেশলাই কাটি জ্বলে উঠল। বলে উঠল, তা' দিলি দিতি পারেন। গরীবের ওপর জুলুম করাই তো বড়মানুষের কাজ।

না, এ ভাষাটাও বহু যুগের ওপারের নয়।

অম্লানকুসুম গম্ভীর ভাবে বললেন, হুঁ। তা' বাবা গরীব মহাশয়, এখানে কী মতলবে উঁকি দিচ্ছিলেন, নিজেই বলুন সেটা। কাকে খোঁজতেছিলেন?

লোকটা ঝপ করে প্রায় মরীয়া গলায় বলে উঠল, এখেনে আমার পরিবার রয়েছে, তার সাতে দ্যাকা করত্যে—

অ্যাঁ কী বললি ? এখানে তোর পরিবার রয়েছে ? ব্যাটা ধরা পড়ে বুঝি এখন পাগল সাজা হচ্ছে ?

লোকটা এখন দার্শনিকের গলায় বলে, সাজতে আর হয়না বাবু, বেয়াড়া পরিবারের হাতে পড়লে, পাগল ছাগল কিছু হতে বাকী থাকে না।

পরিবারের হাতে পড়লে !···তা' বটে।

অম্লানকুসুম আবার কৌতুক অনুভব করলেন। মুখে এসে যাচ্ছিল, এ বাড়িতে তো একটিই বেয়াড়া মেয়েছেলে আছে বাপু, সে তো এই অভাগারই পরিবার।···সামলে নিলেন।···বললেন, তুমি বোধহয় বাপু বাড়ি ভুল করেছ। এখানে কারো পরিবার টরিবার থাকে না।

বাড়ি আমি ভুল করি নাই বাবু। 'পুরোন্দর করাতি' কখনো বাড়ি ভুল করে না।···একটু কাজের কতার লেগেই আসা !··· আপনার এখেনে 'লবঙ্গ' বলে একটা ফার্সাপারা মেয়ে বাসনমাজা কাজ করেনা ? ফার্সাপারা !···অম্লানকুসুমের মনে হল এই কথাটা যেন কোথাও শুনেছেন। কিন্তু 'বাসনমাজা করা' মেয়ের নাম জানবার কথা অম্লানকুসুমের নয়। আসলে ওই কাজটা করার জন্যে কেউ আছে কি না তাও তিনি সঠিক জানেন না।···'বাসন-মাজা করা' শুনে মনে মনে একটু হেসে ফেললেও, মুখে ডাঁটের সঙ্গে বলেন, থাকেই যদি তার সঙ্গে তোমার কী হে বাপু ?

আজ্ঞে ওইতো ! ওইটেই তো আমার পরিবার। আসল বে' করা পরিবার বাবু।

হাসিটা আর চেপে রাখতে পারা যায় না, হা হা করে হেসেই ওঠেন অম্লানকুসুম, বলিস কীরে ? অ্যাঁ ? শুধু পরিবার নয়, একেবারে আসল বে' করা পরিবার। তা' এ'কথা আগে বললে কী হতো রে হতভাগা ?

লোকটা এখন বাতাস অনুকূল দেখে মাথা হেঁট করে ঘাড় চুলকোয়।

নাম কী তোর ?

আজ্ঞে ওই যে বললাম, পুরোন্দর। পুরোন্দর করাতি।

বাঃ। নামের বাহারটিতো খুব, নামের মানেটা জানিস ?

আজ্ঞে বাপ পিতামোর রাখা নাম, আমি কী মানে জানবো ? মানে তো বলে বুজিয়ে যায় নাই।

হুঁ। তা' বাবা পুরন্দর, বাড়িতে কি তোমার পরিবারের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয় না ? তাই একটা 'কতার লেগে' এখানে ধাওয়া করেছ ?

বাড়িতে ?

পুরন্দরের স্বর উচ্চগ্রামে চড়ে।

ওই উগরোচণ্ডা মেয়েমানুষ আছে ঘরে ? লাঠালাঠি ঝগড়া করে পালিয়ে এসে এখানে লুকিয়ে বসে আছে আজ দশবারো দিন। বেস্তর অনুসন্ধান করে তবে না টের পেলাম, এই নতুন বাড়িতে বাসনমাজা করার কাজ নিয়ে সেঁদিয়ে বসে আছে। একবার খালি ডেকে দ্যান বাবু।

দ্যাখো বাপু, আমি জানিনা এখানে ওই নামে কেউ কাজ করে কিনা। তবে সে যদি তোমার হাত থেকে পালিয়ে এসে থাকে, তোমার হাতে তাকে ধরে দেব কেন ?

হাতে ধরে ? হুঁঃ। তেমনি ভালমানুষটি বটে। বললাম না, উগরোচণ্ড সিংঙেখাবাহিনী। সোয়ামাকে বলে, 'কুড়ে', 'শরীল-বাতিক' 'গতোরশোকা'। হাত পা কোলে নে বসে থেকে পরিবারের ওজগারের অন্ন ধ্বংশায়।

বটে। তা' তুই তাই করিস নিশ্চয়।

অ্যাই দেখেন বাবু, আপনিও এই কতা বলতেচেন।…শরীল-বাতিক হতে যাবে ক্যানো ? মানুষের শরীল সব দিন বয় ? তো

ঘরে বোস করে থাকা দেকলেই গালমন্দ। মরুকগে, একবার ডেকে দ্যান না বাবু বুজ করিয়ে ঘরে নে যাই।

বুঝ করিয়ে, হা হা হা। বল কাজটা কী তোর?

আজ্ঞে ঘুঁটে গেরামের পুরোন্দর করাতির কি আর আপিসে চাকরী হবে? মজুর খাটা কাজ। বলি খাটনি নাই তার? দু'দিন উপরি উপরি খাটলি গা গতর নাড়তে নারি।…তো 'পয়সা পিচাশ' পরিবার ওই কতা বলে। 'গতরশোকা'! হাত পা কোলে নে বোস করে দৈনিক দশবারোটা ট্যাকা লোকসান।

তা অন্যায় কিছু বলোনি বাপু। মাসমাইনের চাকরী হলে তো তোমায় দৈনিকই খাটতে হতো।

এই তো বাবু। আপনি দেকচি সমানেই আপনার ওই বাসন-মাজা করুনির দিকে। সেও আমায় তার দৈনিক তিন বাড়ির 'তিন পাঁজা বাসন' দেকায়। যাকগে বাবু, ও তক্কের শেষ নেই। অ্যাখোন তারে একবার ডেকে দ্যান। কিন্তুক বাবু ও যা দজ্জাল মেয়েছেলে, হয়তো বলে বোসবে 'সোয়াসী ফোয়ামী নাই আমার।' বরং এইটি বলা করবেন, তোমার বাপের দেশ বোড়াল থেকে একজনা তোমারে খোঁজতে এয়েচে।

বাঃ! বাঃ! পরিবারকে তো ভালই চিনিস দেখছি। তোর ওপর যার এতো ভক্তি, সে যাবে তোর সঙ্গে?

আচ্ছা অম্লানকুসুম এভাবে একটা তুচ্ছ লোকের সঙ্গে তুচ্ছাতি-তুচ্ছ কথা নিয়ে এতোটা সময় নষ্ট করছেন কেন? এটা আশ্চর্য নয়? অম্লানকুসুমের ছেলে মেয়েরা দেখলে বাবার গায়ে ধুলো দিত।…এমনিতেই তারা বাবার গাঁইয়াদের সম্পর্কে 'প্রীতি প্রীতি ভাব' নিয়ে হাসে ঠাট্টা করে।…কর্মকালে ঘুরছেন তো অনেক জায়গায়! হয়তো একটা আমওলা, কি একটা ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ান, অথবা একটা গোয়ালা, তার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ফেলে দিব্যি গল্প করতেন

অম্লানকুসুম....কিন্তু সে তো বাংলার বাইরে টাইরে। তারা তো অবাঙালী। সে এক রকম। কিন্তু এ কী? বাসন মাজুনির বরের সঙ্গে বাড়ির কর্তার এতো গল্প! যেন সমশ্রেণীর সঙ্গে কথা বলছেন!

কে জানে কেন হয়তো একটা 'রোমান্সের' মত রোমাঞ্চকর বাসনার চেতনা অম্লানকুসুমের মত একটা বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে বোকা বানাচ্ছে।

অম্লানকুসুম যেন গহনকুসুম নামক একটা সত্তার কাছে আত্মসমর্পণ করে বসেছেন! তাই তার ভাষায় কথা বলছেন। তার গলায় হাসছেন। তাঁর মত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এর সঙ্গে আলাপ জমাচ্ছেন আর সেটা পারছেন বলে বেশ আত্মগৌরব অনুভব করছেন। অতঃপর অম্লানকুসুম তাঁর 'দরবার কক্ষে' বসে এই অবোধ স্বামী স্ত্রী দুটোর অকারণ ঝগড়াটা মিটিয়ে দিয়ে, ওদেরকে আবার 'সুখের জীবনে' প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন। যেমন করে দিতেন গহনকুসুম।

অম্লানকুসুমের সামনে ছড়ানো ছিটানো রয়েছে যে ছোট ছোট কুঁড়েগুলো, মাঝে মাঝে টিনের চালাঘর, ওর মধ্যে থেকে দারিদ্র্যপীড়িতের চেহারা নিয়ে ঘুরে বেড়ানো—দুঃস্থ দুঃখী, অবোধ অভাগা মানুষদের সুখ দুঃখের খোঁজ নেবেন।···তাদের সমস্যার সমাধান করে দেবেন।

'বুদ্ধির অভাবে অথবা বুদ্ধির দোষে এই সব লোকেরা কী হতভাগা মূর্তিতেই ঘুরে বেড়ায়, কী কষ্টই পায়!' বলতেন একথা, এল. এম. এস. ডাক্তার প্রভাতকুসুম।···দুঃখী দুর্দশাগ্রস্ত দারিদ্র্যপীড়িতদের নিয়েই তো কারবার ছিল তাঁর।···ফী নেওয়া চুলোয় যাক, ওষুধের দামও বরবাদ, বরং পথ্যির খরচা দিয়ে আসতেন।

পুরন্দর বলল, আজ্ঞে সহজে কি আর যেতে চাইবে? মাতাটা আমার হ্যাঁট করতেই হবে।

তা দুজনের মধ্যে বনেনা যখন, তখন দুজনে দু জায়গায় থাকাই তো ভাল।

পুরন্দর হঠাৎ অনেকখানি জিভ কেটে বলে ওঠে, বাবু যে কী বলেন। আমি কি আপনার পরিহাসের যুগ্যি,···ঘটিটা বাটিটা একত্রে থাকলেও ঠোকাঠুকি নাগে। আর এতো জলজ্যান্ত দুটো মানুষ। ···তা বলে, ঠোকাঠুকির ভয়ে ছাড়ান কাটান করে বসবো। দেন বাবু দেন একবার ডেকে দ্যান।

দিচ্ছি দিচ্ছি, দেখি সত্যিই তোর কেউ আছে কি না। কী বললি? বোড়াল থেকে লোক এয়েছে? বাপের বাড়ির?

হুঁ।

তুই কোথাকার?

এজ্ঞে, আমি বহুৎ দূরের। জঙ্গীপুর থানার ঘুঁটে গেরামে আমার বাপ-পিতমোর ভিটে ছেলো।

জঙ্গীপুর থানা!

অম্লানকুসুমের মাথা থেকে পা অবধি যেন একটা বিদ্যুৎ শিহরণ খেলে গেল। আর তারপর তার উপরে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে বললেন, তুই জঙ্গীপুরের ছেলে?

আজ্ঞে জঙ্গীপুর থানা। গেরামটার নাম শুনতে হাসির, ঘুঁটেগ্রাম।

পাড়াগাঁয়ে অমন অনেক অদ্ভুত নাম থাকে। যাহোক একটা কিছু থেকে—অম্লানকুসুম যেন একটা উত্তেজনার শিহরণ অনুভব করেন।

পুরন্দরের অবশ্য এইসব ফালতু কথা ভাল লাগছিল না। তবু বাবুর মন রাখতে বলল, বুঝেচেন! শুনেচি লবাবি আমলে, গোয়ালারা নাকি ওখেনে মণ মণ মাখন ঘুঁটতো ঘী বানাতে। তাই অঞ্চলটার নামই হয়ে গেল ঘুঁটে। বাবু লবঙ্গকে একবার খানি।—

অম্লানকুসুম যেন আত্মবিস্মৃত।

অম্লানকুসুম লোকটার অসহিষ্ণু ব্যস্ততা দেখেও ব্যগ্র ভাবে বলেন, জঙ্গীপুর টাউনে গেছিস কখনো?

ছোটকালে একবার খুড়োর কাঁদে চেপে ডাক্তার দেকাতে গেচলাম। পায়ে পাঁচড়া ঘা হয়েছেলো—

অম্লানকুসুম সত্যিই বড় বেশি 'রোমাণ্টিক' হয়ে যাচ্ছেন। বড় বেশি ভাবপ্রবণ!... এই পুরন্দর নামের লোকটা যদিই বা 'ছোট-কালে' ডাক্তার দেখাতে জঙ্গীপুরে গিয়ে থাকে, অম্লানকুসুমের ছোট-কালের সীমান্ত রেখাটুকুও কি স্পর্শ করা সম্ভব তার? স্পর্শ করা সম্ভব প্রভাতকুসুম ডাক্তারের পদধূলি?

কাণ্ডজ্ঞান থাকলে সেই সম্ভাবনাটি কল্পনা করে এমন চাঞ্চল্য অনুভব করে না কেউ। অথচ অম্লানকুসুম বিগলিত গলায় বলে উঠলেন, ডাক্তার দেখাতে? ডাক্তারের নাম মনে আছে তোর?

না বাবু। সে কোনকালের কতা। খুড়োর কাঁদে চেপে যাবার বয়েস। নামই বা আমারে বলেচে কে? জঙ্গীপুরে আপনার চেনা জানা কেউ আচে বুজি?

আছে? নাঃ!

অম্লানকুসুম একটা নিঃশ্বাস ফেললেন, ছিল। আমারও ওই-খানেই বাপ পিতমোর ভিটে ছিল। আমার জ্যাঠামশাই মস্ত ডাক্তার ছিলেন।

বাবুর জ্যাঠামশাই!

পুরন্দর তাকে মান্ধাতার কাছাকাছি বসিয়ে মনে মনে একটু হাসলো। বললো, তা আপনি যান না দেশে ঘরে?

নাঃ! সে সব বানে ভেসে গেছে।

অ! আহা! বানে যে কত নোকের কত সব্বোনাশ হয়। তা বাবু লবঙ্গকে একবার—

অম্লানকুসুমের এতক্ষণে হুঁশ হয় অম্লানকুসুমের ব্যক্তিগত কথা এই লোকটার কাছে নেহাৎই অবান্তর। লজ্জা করল। তাড়াতাড়ি বললেন, দাঁড়া দাঁড়া।

চটির শব্দ করে চলে এ'লেন। সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলেন।

বেবি, তোদের বাসন টাসন কে মাজে রে?

বেবির সব কিছুতেই হাসি। হাসিই বেবির রোগ। অতএব হেসে গড়িয়ে ডাক দিল, মা ওমা, মাগো, শুনছো? বাপী জিজ্ঞেস করছে, তোদের বাসন মাজে কে? এতোদিনে টনক নড়ল বাপীর।

ওই রকমই ভালবাসা তোদের বাপীর আমাদের ওপর। তা হঠাৎ এ প্রশ্ন।

অম্লানকুসুম রাগ দেখানো গলায় বললেন, হঠাৎ আবার কী? যে কাজ করে, তাকে বল গে তার বাপের বাড়ি বোড়াল থেকে কে যেন এসেছে, খুঁজছে তাকে।

বাপের বাড়ির দেশ থেকে।

শিপ্রা প্রমাদ গণে। এই বুঝি কী এক ফ্যাচাং বাধে। অসীম 'গতরধারিণী' একটি মহিলা'কে পেয়ে শিপ্রা প্রায় ভগবান পাওয়ার তুল্য সুখে কাল কাটাচ্ছে কিছুদিন। হঠাৎ এ আবার কি উৎপাত! অম্লানকুসুমের ওপর রাগ ধরে যায়।

ওর আবার দেশ কোথায়?

শিপ্রার চড়া সুর।

ওই ওইখানে তো ওর বাড়ি। পুকুরটার ওধারে।

অতশত জানি না। আমায় বলেছে লবঙ্গকে একবার ডেকে দিন। বলবেন তার দেশের লোক এসেছে। বলল তো বোড়াল। বোড়াল তো আমাদের এই 'কাছেই না?

জ্বালালে। ···একটা মনের মত লোক জুটেছিল, দেখো আবার কী হয়—

বিরক্ত হয়ে উঠে গেল শিপ্রা।

আমায় আবার বাপের দেশ থেকে খুঁজতে আসবে কে?

বলে লবঙ্গ বাঁধাকপি কুঁচোতে কুঁচোতে উঠে এসে সিঁড়ির তলায় দরজার কাছে বেরিয়েই পুরন্দরকে দেখে অগ্নিমূর্তি হয়ে ঝলসে উঠল।

ফিচেল, শয়তান, ছোটলোক। তুমি আমার বাপের বাড়ির দেশের লোক?

পুরন্দর খ্যাঁকখেঁকিয়ে হেসে বলে, আহা, নয় শোউর বাড়ির দেশেরই হলো। তো দাঁড়িয়ে দুটো কতা কইতে দিবি তো?

না না! তোর সঙ্গে আমার কিসের কথা? যা বেরো। তোর হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে মাসিমার কাছে অন্দরে এসে লুকিয়ে বসে আছি,—তবু সুলুক নে জ্বালাতে এসেছিস? এখানে আমি ঘরের মেয়ের মতন আছি, সাতবাড়ি বাসন মেজে বেড়াতে হচ্ছে না, মাসিমা-দের সঙ্গে এক হাঁড়ির ভাত খাচ্ছি। গরম লাগলে ফ্যানের হাওয়া খাচ্ছি, রাজার হালে আছি। মাসিমাও ভালবাসে। আবার আমি তোর সঙ্গে গিয়ে হাঁড়ির হালে পড়তে যাই। যা যা। কুঁড়ের বাদশা, নেশাখোর।

মনিবানীর গুণগরিমা বেশ জোর গলাতেই কীর্তন করছে লবঙ্গ। ··এবং মনিবানীর মুখে যে আলোটি ফুটে উঠছে, তা না দেখেও অনুমান করছে।

পুরন্দর মিনমিনে গলায় বলে, তোকে তো আর এ বাড়ির কাজ ছাড়তে বলছিনা, শুদু ঘরে গে থাকতে বলতেছি।

হ্যাঁ, ঘরে গে থাকি, আর তুই আমার রোজগারের টাকাগুলো হাত মুচড়ে কেড়ে নে তাড়ি খেতে যাস, কেমন?···যা যা বেরো বলছি! নি-রোজগেরে বেটাছেলের আবার সংসার সাধ! আমি যাচ্ছিনা।

লবঙ্গর প্রবল ঘোষণায় শিপ্রা পুলকিত, বেবি লুটোপুটি, শুধু অম্লানকুসুমই 'জঙ্গীপুর' থানার লোকটার লাঞ্ছিত পরাজিত মূর্তি আন্দাজ করে বিচলিত।

এদের ধারে কাছে কেউই নেই তবে লবঙ্গের গলাতো পাড়া ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে।

অম্লানকুসুম অবাক হয়ে ভাবছেন, আশ্চর্য। এই মানুষটা কতদিন যেন বাড়িতে রয়েছে, টেরও পাওয়া যায়নি।···বৌবি হেসে গড়িয়ে পড়ে বলেছে, মা, লবঙ্গর গলায় এই শক্তি লুকোনো ছিল? যখন 'মাসিমা' কি 'দিদি' বলে ডাকে, গলা দিয়ে তো মধু ঝরে।

হুঃ।···

শিপ্রা কুটিল গলায় বলে, শয়তানের হাতে পড়লে মেয়েমানুষের এই অবস্থাই ঘটে।···

ও মা গো। তুমি সেটা জানলে কী করে? তুমি তো আর শয়তানের হাতে পড়নি?

থাম বাচাল মেয়ে। পাঁচজনের দেখছিনা জীবনভোর? যা একটু দেখগে দিকিনু, তুতিয়ে পাতিয়ে না নিয়ে যায়। উঃ! কত ভাগ্যে একটা রাতদিনের লোক জুটেছে! ভগবানই জুটিয়ে দিয়েছে, নইলে কাজকরা লোক এতো আপন হয়? কী না করছে বল? ক্ষমতাও কী অসীম। উঃ! কোথা থেকে যে শনিটা এসে জুটল! তোর বাপীই যত নষ্টের গোড়া। বলে দিলেই হতো লবঙ্গ নামে এখানে কেউ থাকেটাকে না। ও বলেছিল পথে বেরোনো ছাড়া আর সব করবো মাসিমা! পথে বেরোলেই হতভাগা আমায় ধরবে।

বাঃ, বাপী কী করে এতো সব জানবে?

কিছুক্ষণ স্তিমিত ছিল, এই সময় আবার লবঙ্গর উদাত্তকণ্ঠ ধ্বনিত হলো, হ্যাঁ এখোন তো নাক কান মুলছিস। ঘরে নে গিয়ে যে কে সেই হবি।···কতায় বলে স্ববাব যায় না মলে। আর 'ঘর' দেকাতে আসছিস আমায়? ঘরের কি ছিরি রে? বিষ্টি পড়লেই ঘরের মেজেয় গামলা বালতি পাতো, চৌকী টেনে নে এ দেওয়াল ও দেওয়াল করো। মজুরের এমন মুরোদ নেই, যে নিজের চালটা

ছায়। যা যা, তুই আমার কেউ না। তোকে আমি চিনি না, ব্যাস।

এখন শিপ্রা অতি আধুনিক হলেও, একদা সময় অসময়ে হরির লুঠ মানতো। ···এখন আবার পুরনো অভ্যাসটাকে মনে মনে ঝালালো।

নিশ্চিন্ত নিশ্বাস ফেলে শিপ্রা আবার গল্পের বইখানা হাতে তুলে নিলো।

কিন্তু চলে আসছেনা কেন লবঙ্গ মাসিমার কাছে ?

শিপ্রা যে তাকে অভিনন্দন জানাবার জন্যে কথা সাজাচ্ছে। খুব মেয়ে বাবা! আচ্ছা টাইট দিয়েছিস। আমি তো শুনে তোকে সাহসের জন্যে বাহাদুরী দিচ্ছিলাম।

তারপর লবঙ্গ নামের মেয়েটার মন থেকে মমতা, বা দুর্বলতার বাষ্পটুকু পর্যন্ত মুছে ফেলার জন্যে, বদ স্বামীর সঙ্গে ঘর করার চাইতে যে একা থাকা শতগুণে ভাল সেটা বোঝাবার জন্যে, সভ্য দেশে সভ্য সমাজে ডিভোর্সটা কত চালু তার নজীর দিয়ে দিয়ে ওর মনটাকে শক্ত করে দেবে।

এই সবই ভাবছিল শিপ্রা, কিন্তু হঠাৎ এমন সুনসান হয়ে গেল কেন ?

ভয়ার্ত গলায় শিপ্রা মেয়েকে ডাক দিল, অ বেবি, দেখনা একবার কী হল ? লবঙ্গর আর সাড়া পাচ্ছিনা কেন ?

রান্নাঘর ভাঁড়ার ঘর ডাইনিং স্পেস্ (অম্লানকুসুম যাকে 'খাবার দালান' ছাড়া আর কিছু বলে উঠতে পারেন না) এসবই তো নীচের তলায়। কাজের লবঙ্গর কর্মক্ষেত্র সেইখানেই। দেখতে হলে নীচের তলাতেই নামতে হবে।···অতএব বেবির খোসামোদ। সিঁড়ি ভাঙ্গাটা শিপ্রার বাঘ। আঃ। কী আরামেই আছে শিপ্রা কিছুদিন। কুটনো কুটে মশলা বেটে, ময়দা মেখে নিয়ে, এক কথায় আহার-আয়োজনের যাবতীয় কর্মকাণ্ড একা হাতে সমাধা করে লবঙ্গ

এমন উপাদেয় রান্না করে টেবিলে ধরে দেয়, যে বেবি আর টিটো মায়ের মুখের উপর বলে বসে, যাই বল মা তোমার থেকে ও অনেক ভাল রাঁধে।

খড়্গপুর থেকে বিনুও ইতিমধ্যে এসেছিল একবার, সেও বলেছে—এই জুয়েলটিকে পেলে কোথায় ?

আর শিপ্রার দিদি।

নিঃশ্বাস ফেলে বলেছেন, যার কপাল ভালো হয়, তার সবদিকেই হয়। নইলে এই ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে এসে বাড়ি করেও শিপ্রার কপালে এমন কাজ-করুনী জোটে ? আমি আজ তিন বছর সল্টলেকে গিয়েছি। একসঙ্গে তিনটে মাসও আরাম আয়েস কাকে বলে জানলাম না। আজ আসছে, কাল ছেড়ে যাচ্ছে। ভাওচি, চারদিকে ভাওচি।···আর দেখতে শুনতেও কেমন ভদ্র, ফর্সা। হাতে খেতে অপ্রবৃত্তি হয় না।

এই লবঙ্গ।

যাকে শিপ্রার মন্ত্রপূত কবচ দিয়ে টিঁকিয়ে রাখতে ইচ্ছে করে, তাকে কোন্ চিল শকুনে ছোঁ মেরে নিয়ে যেতে এলো গো ?···

বেবি এসে হি হি করতে করতে বলল, লবঙ্গ রান্নাঘরে বাঁধাকপি কুঁচোচ্ছে।

আঃ বাঁচলাম। উঃ, তা আমার কাছে একবার এল না।

আসবে আবার কী জন্যে ? রান্নাফান্না কী চাপিয়ে গিয়েছিল, তাড়াতাড়ি চলে এসেছে।

আর লক্ষ্মীছাড়া বরটা ?

তাকে তো বিদেয় করে দিয়েছে বলল।

শিপ্রা দ্বিতীয় দফা হরির লুঠ মানস, মা কালীর কাছে।

জঙ্গীপুরের পরাভবে আপাতত ম্রিয়মান হলেও হাল ছাড়লেন না অম্লানকুসুম। একটা বিধ্বস্ত দাম্পত্য জীবনকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে দেবার শুভ সংকল্পটি মনের মধ্যে লালন করে রেখে অম্লান-কুসুম বিকেলের দিকে রাস্তায় বেরোলেন। এবং ধরলেনও পুরন্দর নামের সেই হতভাগা চেহারার লোকটাকে।

আগে লবঙ্গকে দেখেননি অম্লানকুসুম। আজ দেখেছেন, দেখে প্রায় চমকেই গিয়েছিলেন। চেহারাটা রীতিমত ভদ্র সুন্দর। বেবির মতই ছাপা একটা শাড়ি (এটা যে বেবিরই দাতব্যের দান, তা অবশ্য খেয়াল করেননি।) ওদের মত করেই গুছিয়ে পরা। ওই পুরন্দরটার পাশে ভাবা যায়নি। তবে গলা যখন তুলল লবঙ্গ তখন অম্লানকুসুম বিবেকমুক্ত হলেন।···

কী রে? পরিবারের সঙ্গে পেরে উঠলি না?

হাসলেন অম্লানকুসুম।

পুরন্দর নামের লোকটা আচমকা রাস্তার মাঝখানে এই প্রশ্নে থতমত খেল।······তাকিয়ে দেখল। সকালে বুঝতে পারেনি বাবুর এমন একখানা রাজসই চেহারা। কোঁচানো ধুতি, গিলেকরা পাঞ্জাবী, হাতে একটা সৌখিন ছড়ি, উজ্জ্বল গৌর রং, দীর্ঘোন্নত গঠন, দুটো আঙুলে দুটো আংটি।···তাকিয়ে দেখবার মত···।

গহনকুসুমকেও যারা রাস্তায় দেখতো, তাকিয়ে দেখতো।

কোর্টে নাম ছিল সৌন্দর্য উকিল।

বেবির কাছে যখন বলেছিলেন অম্লানকুসুম, 'এই আমার একটা ধুতি সেট বার করে দেতো,' বেবি হেসে গড়িয়েছিল। কেন বাবা, কোথাও নেমন্তন্ন আছে নাকি?

না না, এমনিই। ভাবছি বিকেলবেলা একটু 'ফুলবাবু' হয়েই বেড়াতে বেরোবো।

এই অজ পাড়াগাঁয়ে?

আরে অজ পাড়াগাঁ বলেই তো। রাস্তায় গাড়ির ভীড় নেই। আলগা আলগা হাঁটা যায়।

বেবি হাঁক পেড়েছিল। ওমা, ভূতের মুখে রামনাম শোনো। বাপী ধুতি সেট চেয়ে পরছে। বাপী, হি হি, মা যখন বলে, তখন যে বড় বলো, অফিসকালের দরুণ এতো শার্ট প্যাণ্ট জমে আছে, ওইগুলোই সদ্ব্যবহার হোক না। আবার ধুতি টুতি কেনা কেন?

অম্লানকুসুম হেসে বলেছেন তোরা মায়ে ঝিয়ে এতো রকম সাজ পাল্টাস, আমি নাহয় একবার পাল্টালাম।

তা সেই পাল্টানো সাজের মধ্যস্থিত ব্যক্তিটিকে দেখে পুরন্দর আভূমি প্রণাম না করে পারল না। তার পর বলল, দেকলেন তো বাবু উটি কী খাণ্ডার? পইপই করে বললাম, 'আর ঘরে বোস করে থাকবনি, রোজদিন কাজে বেরোবো, মজুরির ট্যাকাটা নে এসে কড়ায় গণ্ডায় তোর হাতে ধরে দেব তো কে শোনে কার কতা। বলে 'ওসব ঢের শোনা আছে। আমায় নে গেলেই তুই নিজ মূর্তি ধরবি।' দিব্যি দিলেসা কিছু মানলনি। ট্যাকা হাতে পেলেই নাকি আমি বদন সার দোকানে ছুটবো।···কতা না মানলে আর কী করবো বলেন?'

অম্লানকুসুমও সামনের লোকটার দিকে তাকিয়ে দেখলেন। একেও যদি বাড়ি নিয়ে গিয়ে তেল সাবান সাপ্লাই করে, ফর্সা পায়-জামা গেঞ্জি উপহার দিয়ে বাড়ির মধ্যে ঘুরতে দেওয়া হয়। লবঙ্গর সঙ্গে এমন আর কি বেমানান হবে? তফাতের মধ্যে গায়ের রং।··· মনে মনে একটু হাসলেন অম্লানকুসুম। জঙ্গীপুরের মল্লিক পরিবার রঙের জন্যে বিখ্যাত ছিল। তাই নামেরও এত বাহার। সে বাড়ির ছেলে মেয়েদের সঙ্গে পরের বাড়ি থেকে এনে এনে যাদের জোড়া হয়েছে, তারা কি সবাই এক রকম?

অম্লানকুসুমের ছোট পিসি শতদলবাসিনীর বর ছোট পিসের

রঙের তুলনা দিতে ছোটরা অনেক ভেবে চিন্তে ছাতার কাপড়ের মত ছাড়া সঠিক তুলনা খুঁজে পেত না।

অম্লানকুসুমের মাও সোজাসুজি শ্যামাঙ্গী সুন্দরীই ছিলেন, আর শিপ্রা? সেও বিয়ের পর বলতো, 'তুমি আমার হাতের ওপর হাত রেখোনা তো', নিজের হাতটা দেখলে রাগ হয়।' এখন অবশ্য ভঙ্গী আলাদা। শিপ্রাই যে অম্লানকুসুমকে সর্বদা ধন্য করছে, এই ভঙ্গীতেই থাকে শিপ্রা।

কাজেই রঙের পার্থক্যটা কিছুনা।

পার্থক্য ভব্যতার।

অম্লানকুসুম বললেন, আচ্ছা, তুই যদি মাস-মাইনের চাকরী পাস? করবি মন দিয়ে? অধিক খাটুনি নেই, খাবি দাবি থাকবি।

পুরন্দর অবিশ্বাসের গলায় বলে, কে এই হতভাগারে তেমন চাকরী দেবে বাবু?

ধর আমিই দিলাম।

অম্লানকুসুম কৌতুকের গলায় বলেন, তোর পরিবার যেমন গিন্নীমার ডিপার্টমেণ্টে আছে, থাকবে। তুই কর্তাবাবুর ডিপার্ট-মেণ্টে ভর্তি হবি। হা হা হা হা।

ছলনা করতেছেন বাবু।

ছলনা আবার কী রে? তোকে আমি কাজ দেব। টানা পাখা টানতে পারবি?

টানাপাখা?···শরৎ দাস হাঁ করে তাকাল।

অম্লানকুসুমের জমির দালাল শরৎ দাস অম্লানকুসুমকে বাড়ি সংক্রান্ত ব্যাপারে অনেক সাহায্য করেছে। অনেক জিনিসও সাপ্লাই করেছে।

অম্লানকুসুমের বৈঠকখানা ঘরের ওই মজবুত খড়খড়িদার সাবেকি ধরনের জানলা, দরজাগুলো শরৎই জোগাড় করে দিয়েছে। পাথুরে-ঘাটায় কোথায় একটা ভাঙা বাড়ির মালমশলা বিক্রী হচ্ছিল, শরৎ দাস এসে খবর দিয়েছিল, মল্লিক মশাই, আপনি যেমনটি চাইছিলেন, পাওয়া গেছে।...নতুন বানাতে দিলে, ঠিক এ জিনিসটি হতো না। ...এখনকার মিস্ত্রীরা এ ডিজাইন জানেই না।...খড়খড়ি করে ফিক্সড্। 'পাখি তুলে' দেখবে এমন শখ এখন আর নেই কারুর। যত নতুন বাড়ি তৈরী হচ্ছে অধিকাংশই কাঁচের জানলা। লোহার গ্রীল কাঁচের পাল্লা, ভারী ভারী পর্দা দিয়ে রোদ আলো ঢাকা।

তা সে তো আমার এই বাড়িতেই হয়েছে বাপু। আগাগোড়া কাঁচ।

উপায় কি! ভালো কাঠ পাচ্ছেন কোথায়? দামও তেমনি।

তা 'তেমনি'র ওপর চারগুণ মাশুল চাপিয়ে সেকেণ্ড হ্যাণ্ড মাল এনে দিয়ে বাহাদুরী নিয়েছিল শরৎ।...দেওয়াল আলমারীর ওই প্যানেল করা পাল্লা, কারুকার্য করা কার্ণিশ, এও শরতের অবদান।...

কিন্তু টানা পাখা!

শরৎ হাঁ করে তাকাল।

সে মাল আবার কোথায় মিলবে?

নাঃ, শরতের আন্দাজের বাইরে।

বলল, ও জিনিস আর তো এখন বহুকালাবধিই চালু নেই।

নেই, আবার করতে হবে।

অম্লানকুসুম জোর দিলেন, যা আপনাদের কলকাতার লোড্-শেডিং। এরপর অফিসে আদালতে দেখবেন টানাপাখা চলছে। হয়তো রাজভবনেও পাখাকুলি ঢুকবে।...

শরৎ হাসল। বলল, জেনারেটার তো থাকবে।

জানিনা আপনাদের কি থাকবে আর না থাকবে। আমি তো দেখছি বাপু সভ্যতা ক্রমশঃ পিছন পানে হাঁটছে। কিন্তু অম্লানকুসুম

একটু অন্যমনস্ক গলায় বললেন, কিন্তু অতীতের ভালগুলো কি ফিরে আসবে আর ? বিশাল চরিত্রের, খাঁটি চরিত্রের ভদ্র সভ্য তেজী চরিত্রের মানুষের দেখা সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে আর ?

শরৎ বলল, কী বলছেন মল্লিকবাবু ?

নাঃ তেমন কিছু বলছি না। বলছি—অর্ডার দিলে পাওয়া যাবে না ?

তাই ভাবছি। কিন্তু কোথায় অর্ডার দেব সেটাই চিন্তা।

দেখুননা চেষ্টা করে। মনে হয় বড়বাজারের দিকে টিকে—

বাজার ঘোরার পাথেয় স্বরূপ বেশ কিছু টাকা ধরে দিলেন অম্লানকুসুম শরৎকে।

অদৃশ্যে টানা পাখা, অদৃশ্যে শূন্যে দোদুল্যমান। ···তবে 'পাঙখা বরদার' চাকরিতে বহাল হয়ে গেছে। ···খাচ্ছে দাচ্ছে লবঙ্গের কাজের সিংহভাগটাই করে দিচ্ছে, আর সুযোগ পেলেই দুজনে প্রেমালাপ, রসালাপ চালাচ্ছে।···যেখানে সেখানে গুজগুজ ফুসফুস।

বেবি এসে হেসে গড়াগড়ি দেয়, মা, এই নাকি তোমার লবঙ্গ, 'উগ্রোচণ্ডা, সিংঘোবাহিনী' ? প্রেমেতো ঢলঢল। দেখগে যাও। কতবার চা খাওয়ায় পুরন্দরকে।···

থামতো, তোকে আর ওদের দিকে অত নজর দিতে হবে না।

অম্লানকুসুম আত্মগর্বের হাসি হাসেন, দেখলে তো শিপ্রা। দুটো জীবন ভেসে যাচ্ছিল, জোড়া লাগল কি না ?

শিপ্রা অবশ্য এ ব্যবস্থায় বিরোধী পক্ষের ভূমিকা নেয়নি।··· লবঙ্গ যে তার বরের জন্যে বেছে বেছে বড় মাছখানা সরিয়ে রাখে, ডালের জন্যে খুঁজে খুঁজে গামলা মাপের বাটি যোগাড় করে, রাশি-রাশি কুটনো কোটে আর তাল তাল তরকারি আলাদা করে রাখে।

'মুকপোড়া মিষ্টি দেওয়া বেগুন গিলতে পারে না। তাই চিনি দেবার আগে তুলে রাখতে হয়' বলে এবং তিনদিন অন্তর গম ভাঙাতে পাঠায়। এসবে শিপ্রা চোখ বুজে থাকে।

খাঁচা ভেঙে পাখি উড়ে যাবার ভয়টা তো রইল না।···তা ছাড়া বাড়িতে একটা পাহারাদারও তো রইল।···এই তো শূন্যের মাঠে বাস করতে আসা, সবাই বলেছে একটা কুকুর পোষো।

যদিও কুকুর একটা আধুনিকতা এবং আভিজাত্যের নমুনা, কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই কুকুরে শিপ্রার বড় ভয়।

তা এ লোকটা বশ্যতায় আর বিশ্বস্ততায় কুকুরের থেকে কিছু কম নয়।

আর চোখের অন্তরালে একটা বৈধ প্রেমলীলার আভাস, কৌতুককরই। অবৈধ হলে আলাদা কথা ছিল।

শিপ্রা খুশী তার সংসারের খুঁটিটি মজবুত হল দেখে, অম্লান-কুসুম খুশি তাঁর পরিকল্পনা কার্যকরী হল বলে এবং জঙ্গীপুর থানার লোক সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত হল বলে।

তোমার লবঙ্গতো তার 'হতোভাগা লক্ষ্মীছাড়া' বরকে রান্নাঘরের দরজায় বসিয়ে গরম পাঁপড় ভাজা খাওয়াচ্ছে গো।

বৈঠকখানা ঘর সাজাবার জন্যে অম্লানকুসুম নীচের তলাতেই থাকেন বেশী। দোতলায় ওঠবার সময় সিঁড়ির পাশের রান্নাঘরটায় চোখ পড়বেই। তাই উঠে এসেই এমন এক আধটা খবর সাপ্লাই করেন।

ভালবাসার তো কিছু ঘাটতি দেখি না, পুরন্দর তো রুটি বেলে দিচ্ছে।

শিপ্রা বলে, না দিয়ে উপায় কি?

নিজেই তো কিলো খানেক আটার রুটি খায়। ওকে দিয়ে তুমি

একটু বাগান টাগান করালেও পারো। কবে তোমার টানাপাখা টানবে, সেই ছুতোয় ওই একটা দাস্য পোষা।

বাড়িতে খুব একটা আধুনিক কথা বলে ওঠা যায়না। চির-অভ্যস্ত ভাষাই বেরিয়ে যায়। লতুদির ফ্ল্যাটের পাশের ফ্ল্যাটটা নেওয়া হতো তো জীবন যাত্রার পদ্ধতিই বদলে যেত।

টানাপাখার রহস্য অম্লানকুসুম খুবই গোপন রেখেছিলেন, কিন্তু ফাঁস করে দিয়ে গেছে শরৎ দাস। একদিন অম্লানকুসুমের অনুপস্থিতিতে এসে বলে গেল, বাবু যেটা অর্ডার দিয়েছিলেন সেটার একটা আশা পাওয়া গেছে। দামটা কিছু বেশী নেবে বলেছে। তাই দরদামের কাগজটা এনেছিলাম।

এই বুনোপাড়ায় বাড়ি করার পর থেকে টিটোকে খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। কলেজ থেকে দূরত্বের ছুতো করে বেশীর ভাগ দিন ছোটমাসির বাড়িতেই থেকে যায়, এবং পাশের বাড়িতে ফোন করে জানিয়ে দিতে বলে, আজ আর ফিরছিনা, ভাবতে বারণ করে দেবেন।

আর ওই ফোনটা পাওয়ার পরই বেবি হেসে হেসে বলে, ছোট-মাসির ওই গুটকি ননদটাকে যদি না তোমার বৌ করে ঘরে ঢোকাতে হয় মা, আমার নামে বেড়াল পুষো। যে রেটে ছোড়দা চালিয়ে যাচ্ছে।

শিপ্রাও কি মনে মনে আতঙ্কিত হয় না?

হয় অবশ্যই। কিন্তু ছেলে মেয়ে বড় হলে মেলামেশায় সাবধানতা নিতান্ত গ্রাম্য অনভিজ্ঞাত বলে কিছু বলে উঠতে পারে না। একটু কিছু বললে হয়তো রেবা বলে উঠবে, কোন যুগে পড়ে আছিস মেজদি? দু'টো বাচ্চা ছেলে মেয়ে ছোট থেকে দেখছে।

মেয়েটা সতেরো, ছেলেটা একুশ, বাচ্চা ছাড়া কী'ই বা বলা যায় তাদের?

তা শরৎ দাস সেদিন এসেছিল, সেদিন টিটো বাড়ি ছিল, শুনে আকাশ থেকে পড়ল।

টানাপাখা? আপনি ঠিক শুনেছিলেন?

হ্যাঁ হ্যাঁ। শরৎ দাস কি আর ভুল শুনে ভুল কাজ করবে। বিশেষ অনুরোধ করেছিলেন উনি।

বেবি আর টিটোর মধ্যে চোখে চোখে কৌতুকের ইসারা, তার মানে তুমিও বিশেষ দাঁওটি মারতে বসেছ।···

মুখে বলল, এসব কোন বাজারে পাওয়া যায়?

চট করে পাওয়া যায় এমন বাজার নেই, তবে চেষ্টায় কী না হয়। সিনেমা থিয়েটারে যারা সীন সাজায়, পুরনো জমিদার বাড়ি-টাড়ির দৃশ্য সাজায়, তাদের কাছ থেকেই বলে কয়ে অর্ডার দিয়ে—

গোপনতা ফাঁস হয়ে যাওয়ায় ভারী ক্ষুণ্ণ হলেন অম্লানকুসুম, সাধ ছিল একেবারে সব সাজিয়ে তবে তাঁর স্বপ্নের দরবার ঘরকে লোকের সামনে উন্মুক্ত করবেন।···সেই সাধটা ব্যাহত হলো।

বেবি বলল, বাপীর ওই শরৎ দাস, বাপীর বিদঘুটে খেয়ালের সুড়ঙ্গ পথে বেশ টু পাইস কামিয়ে নিল।

টিটো বলল, সে আর আমার বুঝতে বাকি নেই। ওই পুরনো জানালাগুলোয় কম মেরেছে? এখন আবার এই টানা পাখায়—

শিপ্রা বলল, দ্যাখ, কোন দিন না অর্ডার হয়, ঘুণধরা কাঠের কড়ি বরগা চাই। খোঁজ খোঁজ। যত টাকা লাগে।

অম্লানকুসুমের সামনেই এসব সমালোচনা হয়। এতো আর টিটো নয় যে বলতে সাহস হবে না, 'এ পাড়ায় যারা বাড়ি করে চলে এসেছে তাদের ছেলেরা কি নিত্যি নিত্যি মাসির বাড়িতে থেকে যায়?'

শিপ্রাও নয়, যে সাহস করে বলা যাবে। তোমার সাধের ড্রইং রুমটি সাজাতেই কি কম অপচয় হয়েছে বাপু?

আরে বাবা, বেবিকেই কি মুখের উপর বলা যায়, হ্যাঁরে আঠারো

কুড়ি টাকা এক কৌটো পাউডার। সেই পাউডার তুই মুঠো মুঠো মাখিস, মুঠো মুঠো মেঝেয় ছড়াস?

নাঃ। কাউকে কিছুই বলা যায় না, বাদে কর্তা।…

কর্তা। না সেটা বললে বোধ হয় তেমন ঠিক হবে না। বলা যায় গৃহকর্তা।

কারণ লোকটা বড় বেশী ভদ্র, বড় বেশী মার্জিত।……সে তার রক্তধারার মধ্যে নিতান্ত নিভৃতে একটি ঐতিহ্যের ধারা বহন করে চলেছে। …তাই সে এই উদ্ধত দুর্বিনীত যুগের সংসারে কর্তা হয়ে ওঠার ক্ষমতা রাখেনা। যে যুগে সংসার নিজেই কর্তার নৈবেদ্য সাজাতো, সে যুগ বিগত।

টানাপাখা আসার আগেই অতএব সকলের জানা হয়ে গেছে, ভবিষ্যতে টানাপাখা টানবে বলে একটা 'মুনকে রঘুকে' পুষে চলা হচ্ছে। কী বোকামী। কী অপচয়।

বড় ছেলে খড়্গপুর থেকে ছুটি ছাটায় আসে, তখন ওপক্ষের মধ্যে রীতিমত চিন্তাযুক্ত আলোচনা চলে, বাড়ির কর্তার মাথায় গণ্ডগোল হচ্ছে না তো? মাথার গোলমাল তো হঠাৎ একদিনে ধরা পড়ে না। হঠাৎ হঠাৎ তার এক একটা প্রকাশ ঘটে।

অবশ্য চিন্তাটা সাময়িক। ব্যঙ্গ বিদ্রূপ হাসি ঠাট্টাটাই সর্বদা।

অম্লানকুসুম বাদ প্রতিবাদ করেন না, এমন কি ওদের সঙ্গে হাসি তামাসায় যোগই দেন। তবু শিপ্রা যখন বলেছে, কোনদিন না ঘুণধরা কাঠের কড়ি বরগার অর্ডার চলে যায়।—

তখন মনে মনে ভেবেছেন ইস, আহা তা যদি করানো যেতো সর্বাঙ্গ সুন্দর হতো। মুখে অবশ্য হেসে হেসে বলেছেন ইস, এটা যদি আগে খেয়াল করিয়ে দিতে।

প্রথম দিকে অম্লানকুসুম পরিকল্পনাটা চাপতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু নাছোড়বান্দা স্ত্রী কন্যার কাছে কোনো পরিকল্পনা চেপে রাখা অম্লানকুসুমের সাধ্য হয়না। সবাই জেনে ফেলেছে অম্লানকুসুম

বাড়ির একখানা ঘর, যেটা সব থেকে বড় আর হাওয়াদার ঘর, সেটাকে নিয়ে নয়ছয় করছেন।

দোতলায় অত সুন্দর একখানা সত্যিকার ড্রইংরুম থাকতে, তোমার নিজস্ব একটা বৈঠকখানা মানে কী ?—

উকিল না ডাক্তার তুমি হে, অম্লানকুসুম মল্লিক, তাই অন্দর থেকে তফাতে একটা চেম্বার দরকার তোমার ?—

অথবা তুমি গায়ক, বাদক, শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি, চিত্রকর ? তাই তোমার গুণমুগ্ধ ভক্তরা তোমার নিজস্ব ঘরে ভীড় করতে আসবে ? কিছুইতো নও। গ্রামের ছেলে, স্কুলের পড়া সাঙ্গ হতে কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হলো তোমার মামার বাড়িতে থেকে কলেজে পড়তে। আগে তো ব্যবস্থা ছিল, বহরমপুরে বড়পিসির বাড়িতে থেকে ওখানের কলেজে ভর্তি হবে, কিন্তু তোমার ভাগ্যচক্রে, ঠিক সেই সময় পিসি মারা গেল। সে ব্যবস্থা অতএব বাতিল হলো। পিষে অবশ্য বলেছিল, তা হোক আসুক। আমার গুলোও তো মানুষ হবে যাহোক করে।

কিন্তু পিসের বৌদির কাছে 'মানুষ' হতে যেতে ইচ্ছে হয়নি তোমার। তা'ছাড়া তোমার গোপন বাসনাতো 'কলকাতার' পক্ষেই ছিল।

তা মামার বাড়িতে থেকে পড়াশুনো তুমি ভালই করেছিলে। তোমার বাধ্য বিনীত ব্যবহারে মামী দ্যাওরপো ভাসুরপোদের থেকে ভাগ্নেটিকেই বেশী ভালবেসেছে।—এবং সেই ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ এই 'শিপ্রাটিকে' পেয়েছ তুমি। মামীর দূর সম্পর্কের বোনঝি না ভাইঝি কি যেন।······

মামীর এই ভালবাসাটুকু না থাকলে কে তোমায় গুছিয়ে বিয়ে দিত হে ? চাকরী ফাকরী পাবার আগেই তো ঝপাঝপ তোমার মা বাপ মরে গেল, জ্যাঠাও কিছুদিন পরে দেহরক্ষা করল, জ্যেঠি ছেলে-মেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেল।—আশ্রিত প্রতিপালিত

বহু পরিজন সমেত একান্নবর্তী পরিবারটা ছত্রখান হয়ে কোথায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল।

তা এ তো বাপু শতকরা আশীটা সাধারণ মফঃস্বলের ছেলের ছকে বাঁধা জীবন।—বড়জোর কারুর কারুর মা টা শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে পরবর্তী কালে ছেলের বৌকে জ্বালাতে, অথবা দু'চারটে অপোগণ্ড নাবালক ভাইবোন থাকে মানুষ করতে।

সেদিক থেকে তুমি একটু ঝাড়া হাত পা। তা বলে কল্পনাবিলাসী হতে বসবে তুমি?—কই আগে তো এমন বোঝা যেতনা—গাঁইয়া প্রীতি একটু ছিল বটে, সে এমন কিছু বিপজ্জনক না।—

কই, তুমি তো তোমার সেই জ্যেঠির বাপের বাড়ির খোঁজ করে করে তাদের সন্ধান রাখতে যাওনি? কে জানে কে কোথায়? ফুল্লকুসুমই তো মাত্র বড় ছেলে। তার নীচে নাকে জল ঝরা গোটা চার পাঁচ মেয়ে ছিল। এ পর্যন্ত কাউকেই তোমার মনে নেই।

আর তুমি যখন কর্মসূত্রে ডালটনগঞ্জে না লাহেরিয়া সরাই কোথায় যেন রয়েছো হঠাৎ একদিন জানতে পারলে জঙ্গীপুরের সেই 'মল্লিক-বাড়িটা' পার্শ্ববর্তী অনেকখানি অঞ্চলসহ গঙ্গার তলায় তলিয়ে গেছে। তখন তুমি কয়েকদিন মাত্র রাত্রে একটু কম ঘুমিয়েছ, উঠে পায়চারী করেছ, বারবার জল খেয়েছ, এর বেশী কিছুনা। তোমার বৌ বুঝতেও পারেনি কারণটা কি। বলেছে, বায়ু হয়েছে। বলেছে টাইকো সোডা খাও।

তা সাতপুরুষের ভিটে তো লোকের পড়ে পড়ে ভগ্নদশাগ্রস্ত হয়ে ভূমিস্যাৎই হয়। ইচ্ছে যে ভালবাসার প্রাণ নিয়ে ছুটে ছুটে দেখতে যায়। আর পদ্মাপাড়ে যাদের বাড়ি? তাদের তো এ ঘটনা 'ভাতজল'। কাজেই তোমার কিছু অসাধারণ ধাক্কা নেই।···

বলতে হয় তাদের। যারা দেশভাগের বলি হয়েছে। তুমি তো দিব্যিই জীবনটা বাঁধা ছকে কাটিয়ে এলে। যেমন কাটিয়ে আসছে পশ্চিমবঙ্গের মানুষরা। তোমার ভিটে যখন জলের তলায়

তলিয়ে গেছে, তুমি তখন ছেলে-মেয়ে নিয়ে বিব্রত। কী ভাবে ছেলেটার লেখাপড়ার সুবিধা করা যায়, কী ভাবে সামলানো যায়। তখনতো শুধু বিলু। হে অম্লানকুসুম, অবশেষে তুমি রিটায়ার করেছ, অফিস থেকে মোটা টাকা গ্র্যাচুয়িটি পেয়েছ, লাইফ ইনসিওরেরও কিছু কিছু সময়-সীমা পূর্ণ করে হাতে এসে গেছে। তুমি তোমার মধ্যবিত্ত মনটাকে নিয়ে বালীগঞ্জে অতি আধুনিক ফ্ল্যাটের ধারে কাছে না ঘেঁষে, গণ্ডগ্রামের কাণ ঘেঁষে শহরতলীতে একখানি বাড়ি বানিয়েছ।···এই তো জীবন তোমার। থালায় রাখা জলের মত সবটা দৃশ্যমান। সবটা সোজা সরল।

এর মাঝখানে তুমি কোন ফাঁকে মনের মধ্যে একটা বিদঘুটে খেয়ালের চাষ করেছ বসে বসে বলতো? তাই বাড়ির উদ্বৃত্ত অংশ-টুকু ভাড়া দিয়ে সংসার করার চেষ্টা না করে তুমি সেখানে খেয়ালের চারা পুঁতেছ।—আয়ের বদলে ব্যয় করে চলেছ সেই ঘরের পিছনে।

তুমি মনে করেছ হে অম্লানকুসুম মল্লিক, স্ত্রী-পুত্রদের জন্যে বাড়ি বানিয়ে দিয়েছ, যেখানে যা সাজে সজিয়ে দিয়েছ, ফ্রীজ, টি-ভি সেট, কুকিং রেঞ্জ, রেকর্ডচেঞ্জার কত কীই দিয়েছ, অতএব আর কোন দায় নেই তোমার। এখন তুমি তোমার শখ মেটাবে বসে বসে। অথচ তুমি জান—হ্যাঁ জানো, তোমার বৌ, ছেলে-মেয়ে সবাই কবে থেকে আশা করে বসে আছে, বাড়ির পর গাড়ি একটা হবে তাদের।

প্রত্যক্ষে এবং পরোক্ষে এমন অনেক মন্তব্যই শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, অনুক্ত মন্তব্যগুলো-ও ওদের মুখের রেখায় রেখায় ফুটে উঠছে। অম্লানকুসুম কিন্তু নির্বিকার।

অম্লানকুসুম নিজের সংকল্পে অটুট।

তাই অম্লানকুসুমের টানাপাখা এসে যায়, গোলপায়া, চকচকে

পালিশ ঘরজোড়া চৌকী এসে যায়, এসে যায় তিন দেওয়ালের জন্য তিনটে কেটো বেঞ্চি।

তবু এর মধ্যে যে আবার অম্লানকুসুম হঠাৎ মিস্ত্রী লাগিয়ে ঘরের হালকা আকাশী নীল রং ঘষিয়ে তুলে চুনকাম করাতে বসবেন এটা ধারনার বাইরে ছিল ওদের।

একটা ভেঙে যাওয়া দাম্পত্য জীবন গড়ে দিতে পারার আহ্লাদেই কি উৎসাহের জোয়ারটা এমন প্রবল হয়ে উঠেছে অম্লানকুসুম নামের মানুষটার? তাই স্বপ্ন দেখছেন, একটুকরো অতীতকে কবর খুঁড়ে তুলে এনে নিজেকে তার মধ্যে স্থাপিত করবেন?···তার এই বৈঠকখানা ফরাসে বসে তিনি আশপাশের দুঃস্থ দরিদ্রদের দাতব্যের ওষুধ বিলোবেন। তাদের জীবনের সমস্যার সমাধান করবার চেষ্টা করবেন। নিরুপায় অসহায় মানুষগুলোকে আপন করে ফেলবেন। আর ওই দুঃস্থ দুর্গত হতভাগ্যদের সত্যকার সংখ্যা সীমা নির্ণয় করতে করতে বিকেলবেলা গহনকুসুম মল্লিকের মত সাজ করে পথে বেরোবেন।

গহনকুসুম বলতেন, দুঃখীদের কাছে দুঃখীবেশে গিয়ে দাঁড়ালে হয়তো মানবিকতা দেখানো হয়, কিন্তু কাজ হয় না দাদা। তোমার দুঃখীবেশ দেখলে তারা তোমার উপর আস্থা রাখতে পারবে না। —ভগবানকে মানুষ অনন্ত ঐশ্বর্যময়, অনন্ত ছলনাময় বলে বন্দনা করতে ভালবাসে কেন? প্রত্যাশার ভাণ্ড হাতে নিয়ে বসে থাকে বলে। যদি বুঝে ফেলতো, ওই ভগবান নামের লোকটাও মানুষের মতই দুঃখী অসহায়, নিয়মের চাকায় বাঁধা, এতো ডাকত?—ভেক কিছু চাই বাপু।

প্রভাতকুসুমের কোনো ভেক ছিল না। প্রভাতকুসুমের পেটে বেল্ট আঁটা, পায়ের পাটিতে জুতো, ঝলঝলে শাদা জিনের প্যান্ট, আর গলাবন্ধ কালো আলপাকার কোট। স্টেথোসকোপটা ঠেলে ঢোকাতে ঢোকাতে সব কোটগুলোরই পকেটের কোণ ঝুলে আসা।

উকিল গহনকুসুম বলতেন, দাদা আনোয়ারের দোকানে তোমার জন্যে পেণ্টুলেন আর চারটে কোটের অর্ডার দেওয়া আছে, মাপটা একবার দেখিয়ে দিয়ে এসো।

প্রভাতকুসুমের সে সময়টুকুও না হলে, হয়তো বা দুটো ছেঁড়া পুরনো কোট প্যাণ্টই দিয়ে আসতেন গহনকুসুম আনোয়ারের দোকানে।

প্রভাত ডাক্তার বলতেন, তুই বড় ব্যস্তবাগীশ 'গনু'। এখন আমার জামা-ফামার দরকার ছিল না, অনেক আছে।

'গনু' বলতেন, যেগুলো আছে আমায় দিও তো। গরীব দুঃখীদের দিয়ে দেব। কোন জিনিসেরই উপসত্বের শেষটুকু অবধি ভোগ করতে নেই দাদা। সংসারে ইঁদুর, আরশোলা, পিঁপড়ে-দেরও কিছু পাওনা থাকে।

প্রভাত ডাক্তার হাসতেন, যাদের যা পাওনা, তারা তা' নিজেরাই ভালমতো আদায় করে নিতে জানেরে গনু, তোর আমার মুখা-পেক্ষী হয়ে বসে থাকে না।

গহনকুসুমের একধরনের চিন্তাধারা ছিল, ভাবা যেত, মাপা-জোপা টিপটপ। প্রভাতকুসুমের ঢিলে-ঢালা, আলাভোলা হয়তো বা বেশীই মানবিকতা বোধসম্পন্ন। তবে কথাবার্তায় জৌলুস কম।

রোগী দেখতে যেতেন ঘোড়ার গাড়ির মধ্যে ফলের ঝুড়ি বসিয়ে। আনারস, বাতাবি-লেবু, পেঁপে, পানিফল, এটা-ওটা ভর্তি করে। আর নিতেন হয়তো পুরনো দাদখানি চাল।

রোগী দেখার পর হাঁক পাড়তেন, গাড়ি থেকে ওগুলো নামিয়ে আনতো রসুল।

রসুল প্রভাত ডাক্তারের খিদমদগার, পথসঙ্গী, বন্ধু, উপদেষ্টা।

এক বুড়ির চিকিৎসা করতে গিয়েছিলেন ডাক্তার, বুড়ি পটল তুললো। তুলবারই কথা। ডেকেছেন যখন তখন আর তার আদায় নেই। তবু ভাঙা ঘরখানার একমাত্র দ্বিতীয় সদস্য, বছর তেরো-

হয়তো সেই জন্যেই অম্লানকুসুমের এমন গোপনীয়তার সখ। পেরে উঠুন আর না উঠুন।

গোপন রাখার চেষ্টাটা করেন।—না। পেরে ওঠেন না, চেষ্টাই সার। নইলে রাজমিস্ত্রী শশীপদকে তো চুপিচুপিই ডাকিয়ে এনেছিলেন।—চুপিচুপিই, পড়ে থাকা বাঁশ বালতি দড়ি কড়াইগুলোকে আনিয়ে নিয়ে বৈঠকখানা ঘরে ঢুকিয়ে ফেলেছিলেন, তথাপি, বেবি ছুটে গিয়ে শিপ্রাকে খবর দিল, মা, দেখবে এসো বাপীর নতুন কীর্তি।

শিপ্রা নেমে এল।

শিপ্রার তীক্ষ্ম প্রশ্নে মিস্ত্রীরা চমকে উঠল!

শিপ্রা দু'বার একই কথা উচ্চারণ করল এটা কী হচ্ছে, এটা?

অম্লানকুসুম অম্লানভাবে বললেন, ভেবে দেখলাম দেওয়াল সাদা রাখাই ঠিক হবে তাই নীল রংটা তুলোচ্ছি।

তারপর?

তারপর আবার কী?—বেবীর হি হি হাসি, তারপর পাটের পোঁচড়া দিয়ে চুণকাম হবে। চুণকাম।

ব্যাপারটার মানে কী?

বললাম তো, দেওয়াল সাদাই ভাল, নীলটা ঠিক নয়।

শিপ্রা আরো তীব্রভাবে বলে, আসলে বেঠিকটা কোথায় ঘটেছে টের পাচ্ছ?

অম্লানকুসুম হাসলেন, বললেন, নিজেরটা আর কে ধরতে পারে? সেখানে তো আশী' পেঁছিয় না। এখন যাও মিস্ত্রীরা তাকাচ্ছে।

শিপ্রা নিশ্বাস ফেলল। মাথায় কী ভূতই চাপল, ভগবান জানেন।

অম্লান বললেন, ভূতের খবর ভগবানের জানার কথা নয়।—এই বেবি, ধুলো উড়ছে, পালা।

আশ্চর্য অবিচলতা।

শিপ্রা দোতলায় উঠে এসে ডানলোপিলোর গদি আঁটা সোফায় বসে পড়ে বলে, তোর কী মনে হয় বেবি, শেষ পর্যন্ত কী মতলব ওর?

মতলব টতলব কিছু না মা। আসলে শখ, খেয়াল, বাতিক, স্বপ্ন, সাধ।—তুমি যেমন, একদিনে চারটে কুশানে ঠিক লতুমাসির ঘরের কুশানের মত এমব্রয়ডারি করে ফেলেছিলে, যাতে তোমার পরদিন জ্বর এসে গিয়েছিল। এ তেমনি একটা শখ।

সেটা আর এটা এক হলো।

প্রায় একই।

হুঃ! এতো যে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করছি আমরা, তা রাগ করেও তো বলছেনা একবার, 'চুলোয় যাক, দরকার নেই।'

রাগটাগ আবার কবে দেখলে বাপীর?

সেই তো মুস্কিল। পুরুষের একটু রাগ থাকা ভাল।

ওরে বাবা, তাহলে তো বাড়িতে সর্বদা নারদ! নারদ!

সর্বদাই এমন অনেক সমালোচনা হচ্ছে। নিজেদের মধ্যে রেগে রেগে আর আত্মীয়জন, বন্ধু-বান্ধব এলে তাদের সামনে হেসে হেসে। নীচের তলায়? নীচের তলায় গেরস্থের তো শুধু কীচেন, স্টোররুম, ডাইনিং স্পেস, আর সার্ভেণ্টস্ রুম। বাকি বড় হলটায় ওনার যাদুঘর।

এখনকার মেয়েদের মত কর্তাকে নাম ধরে কথা বলতে সাধ হয় শিপ্রার, কিন্তু বড় বেশী অনভ্যস্ত বলে পেরে ওঠে না।

শ্রোতা অবাক হয়—যাদুঘর, সেটা কী?

ওই তো মজা। কেউই জানিনা সেটা কী।

না, সত্যিই কেউ তেমন করে জানেনা সেটা কি।

শুধু অম্লানকুসুমই তার সত্তার গভীর থেকে নক্সাখানা টেনে তুলে তিল তিল করে গড়ে তুলতে থাকেন তাঁর স্বপ্নের যাদুঘর। মালিকরা বলতো বৈঠকখানা। ফুল্লকুসুম বলতো দরবারকক্ষ। অথচ আড়ম্বরের বালাই বলতে তো কিছুই ছিল না। লোকে আসতো অসুখ জানাতে, লোকে আসতো নালিশ জানাতে। কৌতুহলটা সেটা ঘিরেই।

আকাশী নীল মুছে ফেলে, দুধ সাদাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, জানালা দরজার হালকা 'অ্যাশ কালার' তুলে ফেলে, লাগানো হয় গাঢ় সবুজ রং, দেওয়াল আলমারির কাঠে বার্ণিশ।...মত পরিবর্তন করে ফেলেছেন অম্লানকুসুম। চার দেওয়ালে যে চারটে দেওয়াল গিরি বসবে, তাতে ইলেকট্রিক বালব নয়, কেরোসিনেরই ব্যাবস্থা হবে।

কলকাতার বাজারে পাওয়া যায় না এমন জিনিষ নেই। পাওয়া সবরকমই যায়, গোল কাঁচের ডুম দেওয়া চারটে আলো এসে গেল। পোঁতা হল চার দেওয়ালে। সীলিঙে টানা পাখা বসল।

কিন্তু তবু তিলোত্তমাকে কি চট করে গড়ে ফেলা যায়? কাজ তো ফুরোতেই চায়না। অভিযানও বন্ধ হয়না অম্লানকুসুমের। একটা নেহাৎ সাদা মাঠা চেহারার ঘরকে জলের তলা থেকে তুলে এনে প্রতিষ্ঠিত করতে এতোসব লাগবে জানা ছিল না।

বেবি বলে বাপী হঠাৎ এতো কম্মিৎকর্মা হয়ে উঠলো কী করে বলতো মা? কেবলি দেখি বাড়ি নেই, কোথায় যায়?

শিপ্রা রেগে রেগে বলে কোথায় যায় আমায় বলে যায়? শুধু বলবে একটু বেরোচ্ছি। তারপর ট্যাক্সীতে বোঝা চাপিয়ে ফিরবে, আর চট করে ওই গুহাঘরে ভরে ফেলে চাবি লাগিয়ে দেবে।...মস্ত একখানা সুবিধে হয়েছে ওই পুরন্দর। যেখানে যাচ্ছে সঙ্গে নিচ্ছে। উঃ। ওটাই যেন ভূত হয়ে ঘাড়ে চেপেছে। প্রথমে এতটা ছিল না।

শিপ্রার নিজেরও অবশ্য মরুভূমিতে ওয়েশিস্ লবঙ্গ আছে···প্রতি পদক্ষেপে লবঙ্গ। প্রতিক্ষণ লবঙ্গ।

লবঙ্গ ফ্রীজ থেকে এক গ্লাশ জল দে তো। পুরো ঠাণ্ডা। লবঙ্গ, ওঘর থেকে খবরের কাগজখানা এনে দে তো।···লবঙ্গ, পাখার স্পীডটা বাড়িয়ে দিয়ে যা তো বাছা।···লবঙ্গ, আমার লণ্ড্রী থেকে আসা শাড়িগুলো আলমারীতে তুলেছিলি?···লবঙ্গ, আজ তো সময় রয়েছে, টেবিলের ড্রয়ারগুলো গোছাবি একটু?···লবঙ্গ, আজ ওবেলা কী রাঁধছিস?···লবঙ্গ, এ সময় আমি কোন্ ট্যাবলেটটা খাই রে? দে তো মনে করে।···লবঙ্গ, কাল থেকে আমার চাবির বাণ্ডটা, ইয়ে থোলোটা খুঁজে পাচ্ছি না রে, খুঁজে দেখনা একটু।···লবঙ্গ, বাথ-রুমের জানালায় বোধহয় আমার কানের ফুলটা খুলে রেখে এসেছি, নিয়ে আয়না বাবা।

লবঙ্গ! লবঙ্গ! লবঙ্গ।
হা লবঙ্গ! জো লবঙ্গ।

এতে কোন দোষ দেখে না শিপ্রা।···শুধু 'পুরন্দর' নামটা গৃহ-কর্তার মুখ থেকে উচ্চারিত হলেই বঙ্কিম হাসি হেসে বলে পাশের লোক তো।

টিটো মাঝে মাঝে বলে, বাপী যে রেটে ট্যাক্সী চাপছে, তাতে তোমার আর ভবিষ্যতে গাড়ির আশা নেই মা।

শিপ্রা ক্রুদ্ধ গলায় বলে, তবুতো একটা ডাক্তার দেখাবার চেষ্টা করিসনা। আমি বলছি···ওকে একটা সাইকিয়াট্রিস্ট দেখানো দরকার।

টিটো অবশ্য মায়ের উত্তেজিত ভাবে মজা পায়। বলে, ডাক্তারকে রোগের লক্ষণ কী বলা হবে? ভদ্রলোক সারাজীবন তার ডিউটি যথাযথ পালন করে, একটা বাড়িফাড়িও বানিয়ে এখন কিনা নিজের

পয়সায় হরদম ট্যাক্সী চড়ছেন আর মার্কেটিং করছেন। উঁহু। এ পেসেণ্ট মনে ধরবে না ডাক্তারের।

ছোটমাসির সঙ্গে মিশে মিশে ঠিক ছোটমাসীর ধাঁচের কথা শিখেছিস। বুঝি বাবা বুঝি, আসল সিম্প্যাথিটি কোন দিকে। আমায় এই সুন্দরবনের কাছ বরাবর নিয়ে এসে ফেলে রেখেছিস, ভাবিস একবারও, কীভাবে বন্দী হয়ে পড়ে আছি। নিজেরা যখন যেখানে ইচ্ছে যাচ্ছিস, আমারই বোনের বাড়ি রোজ যাচ্ছিস, একবারও বলিস, মা যাবে?

আমি কোথা থেকে যাই, তুমি কোথায় থাকো?

সেই কথাই হচ্ছে, আমি কোথায় পড়ে আছি। একখানা গাড়ি থাকলে আমার এ দশা হতো? তোদের পরম পূজনীয় বাপী আবার বলেন, গাড়ি কিনে কী হবে? তাতে তো তুমি মাত্র একখানা গাড়ির মালিক হবে। সে যে সর্বদা সার্ভিস দিতে পারবে এমন গ্যারাণ্টি নেই। আর দেখো আমি এই শহরের হাজার দু'হাজার গাড়ির মালিক। হাত নেড়ে চেপে বসলেই হলো। ড্রাইভার রাখার ঝামেলা নেই, গাড়িকে যখন তখন হসপিটালে পাঠাবার দায় নেই, বাস ক'রতে ঘর দেবার দায়িত্ব নেই, নতুন বিয়ে করা বউয়ের মত, আতুপুতু যত্নের দায় নেই, মাথা ঠাণ্ডা।···ট্যাক্সীর গায়ে কাদা লাগুক আমার বয়ে গেল, রং চটে গেল আমার বয়ে গেল, ধাক্কা খেয়ে ভেঙে গেল আমার বয়ে গেল, অথচ আমাকে যা সার্ভিস দেবার, তা' ঠিকই দিচ্ছে. দেবে।

টিটো হেসে হেসে বলে বাপী খুব ভুল বলে না মা।···ছোট মেসোর দাদার গাড়ি কেনা অবধি যা দেখছি, রোজই একটা করে কি যেন ঘটে আর ছোটমাসী হি হি করে শোনায় আমাদের। সি এম. ডি. এ'র গর্ত, রাস্তার দুর্দশা, তেলের মূল্যবৃদ্ধি ড্রাইভারের অসততা, তার ওপর আবার তার মেজাজ। বলে না কি, দাদা বলেছে, চালাতে শিখে নিয়ে ড্রাইভার তুলে দেবে!···আর ছোট মেসোর বৌদি বলে,

তার মানে তোমার হাতেই থাকতে হবে আমাকে! তুমি তো সর্বক্ষণ তোমার অফিসে, আমার তখন আর কোথাও বেড়াবার উপায় নেই। তার থেকে তুমিও বাপীর মত শহরের সমস্ত ডাবল্, বি, মার্কা গাড়ির মালিক হয়ে পড়ো।

একা একা ট্যাক্সী চেপে ঘুরে বেড়ানো আমার অভ্যেস যে। আমার জন্যে কে সময় দেবে।

আহা! এখন তো আর তোমার সে প্রশ্ন নেই মা। এখন তোমার বাহন রয়েছে। তোমার এই নাবালিকা বালিকা কন্যাটিকে সঙ্গে নিয়ে, বাহনটিকে ভরসা করে বেরিয়ে পড়বে।

বাহন! বাহন মানে?

মানে তোমার ওই লবঙ্গ না দালচিনি কী যেন!

ওর সঙ্গে বেড়িয়ে বেড়াব আমি? ও আমার দিদির বাড়ি চেনে? রেবার বাড়ি চেনে? কাকার বাড়ি চেনে? ঝুনু পিসির বাড়ি চেনে?

আহা! তুমি তো চেনো।

আমি? আমি রাস্তা চিনিয়ে নিয়ে যাব? বাড়ির দরজায় নিয়ে গেলে, বাড়িখানা বুঝতে পারি এই পর্যন্ত। সারাজীবন তো কলকাতার বাইরে বাইরে কেটে গেল।

তা' তোমার ওই এলাচ দালচিনির রাস্তা চেনার কোন প্রশ্ন নেই মা। ঠিকানা পেলে ও তোমায় বিলেত ঘুরিয়ে আনতে পারে।

ওই আনন্দেই থাক। দায়িত্বটা তো মুক্ত হল।

বলে শিপ্রা জোরে জোরে আঙুল চালিয়ে উলের গোলাকে নক্সায় এনে ফেলতে থাকে। এটা শিপ্রার রাগ প্রকাশের একটা চিহ্ন।

রাগ নেই শুধু অম্লানকুসুম নামের প্রৌঢ় ব্যক্তিটির। সর্বদাই আহ্লাদিত মুখ তার। সেই মুখটি নিয়ে এসে দাঁড়ান।

বেবি, বেগুসরাইতে থাকতে আমি যে একটা 'হোমিওপ্যাথি গৃহ-চিকিৎসার' বাক্স কিনেছিলাম সেটা কোথায় জানিস?

সেটা ? সেটা তো তামাদিকালের কথা বাবা।

'তামাদি' কীরে ? বড় জোর সাত আট বছর।

এতদিন থাকবে সেটা ? মা, ও মা। বাপীর 'সরল হোমিও-প্যাথি গৃহচিকিৎসার' বাক্সটা কোথায় ?

শিপ্রা এসে আকাশ থেকে পড়ে।

সেইটা তুমি এতোকাল পরে আশা করছো ?

আহা, কাঠের জিনিস তো। থাকলেও থাকতে পারে। সহজে ভাঙে না তো।

ভাঙে না হারায়।

তাই তো। কিনতেই হবে তাহলে একটা। ভেবেছিলাম, শুধু ওষুধগুলো কিনলেই হবে। যা দাম হয়েছে আজকাল জিনিসের।

দাম ?

শিপ্রার বঙ্কিম ওষ্ঠাধর আর একটু বাঁকে। দাম ? দামে কী এসে যাচ্ছে ? তোমার যাদুঘরের জন্য যখন। যত লাগে লাগুক।

অম্লানকুসুম ঈষৎ অপ্রতিভ হন, যাদুঘর নয়, 'খেলাঘরই' বলো।
··ছেলেমানুষী একটা শখ। মিটিয়ে নিচ্ছি একটু।

তোমার টাকা, তুমি শখ মেটাবে এতে আর কার কী বলার আছে ? কত পুরুষ তো মদ-মেয়েদের পেছনে টাকা ওড়ায়, রেস খেলে। আটকানো যায় ? তবে এখন ভাবছি—ব্যাঙ্কে তোমার সঙ্গে অ্যাকাউণ্ট জয়েণ্ট না করে, আমার একার নামে করলেই ভাল হতো। সেটা করলে আমি অন্ততঃ টের পেতাম, কী গেল, কী রইল।···আমি তো চেক কেটে ওড়াতে বসতাম না। এতো রকম যে কী দরকার তোমার তাও বুঝি না। এই শুনি, বিছানা বালিশ এল, এই শুনি বড় বড় ছবির গোছা এল, এই শুনি বইয়ের বোঝা এল, সাধে কি আর মাথার স্ক্রু ঢিলে হয়ে গেছে।

অম্লানকুসুম ওই ধৃষ্ট মুখটার দিকে তাকিয়ে দেখেন।

অম্লানকুসুম কি বলে উঠবেন, আমার টাকায় আমার কোনো

অধিকার থাকবে না, ভেবেছ কি তোমরা, কিছু বলি না বলে ? বেশ করব, যত ইচ্ছে ওড়াব। কী করবে ?

নাঃ তেমন কথা উচ্চারণ করতে পারেন না অম্লানকুসুম। অম্লানকুসুম চিরকালই একটি শালীনতার দুর্গে বন্দী।······

তাই অম্লানকুসুমকে মুখের হাসিটা বজায় রাখতে হয়। গলা নামিয়ে বলতে হয়, তবু তো মন্দের ভালো। মদ, মহিলায় টাকা উড়ছে না।

চলে আসেন অম্লানকুসুম।

সংসারের প্রতিপক্ষস্বরূপ সেই তাঁর স্বপ্নের যাদুঘরে।···যে ঘরখানাকে অম্লানকুসুম গঙ্গার তলা থেকে ছেঁচে ছেঁচে তুলে নিয়ে আসছেন একটু একটু করে।

তা সেটা যে এতোখানি খাটনি তা আগে খেয়াল করেন নি অম্লানকুসুম।···আবছা একটা ছবি স্বপ্নের নীল আলোর মধ্যে ছায়া ফেলে বেড়িয়েছে, আর হঠাৎ হঠাৎ একটা অগাধ জলের তলায় তলিয়ে গেছে।···যখন সেই জল ছেঁচতে শুরু করলেন, তখন যেন এক টুকরোও ফেলে রেখে আসতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

কিন্তু এখন কি আমি থেমে যাব ?

যা হয়েছে, তাই থাক বলে ছেড়ে দেব ? বাবাকে বলব, 'বাবা, বড্ড লড়াই।'

কিন্তু শিপ্রা তো চিরদিনই ওই রকম ধৃষ্ট কথা কয়।

কবে আর ধর্তব্য ধরেছেন অম্লানকুসুম।···'অমৃতং বালভাষিতম্' হিসেবে উড়িয়ে দিয়ে এসেছেন। এখন কি ওই বোকা মহিলাটির উপর অভিমান করে, আরম্ভ কাজ অসমাপ্ত রাখবেন ? বাকি, বাকি, এখনো অনেক কিছুই বাকি। তাছাড়া পিছনের জমিটায় দুটো পেয়ারা গাছ পোঁতা হয়ে ওঠেনি এখনো। পোঁতা হয়নি গোটা

কতক কাঠ চাঁপা আর করবী। জানালা খোলা থাকলেই যাদের পুষ্পিত শাখা আন্দোলিত হতে দেখা যাবে।

আচ্ছা, তেঁতুল গাছ কতদিনে বাড়ে।

ফল না হোক, পাতা?

ঝিরঝিরে তিরতিরে সেই সদাই নাচুনে পাতাগুলো বেড়ে উঠবে না তাড়াতাড়ি?

তার মানে, ছেঁচতে ছেঁচতে নেশা লেগে গেছে অম্লানকুসুমের। বালির তলায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেখছেন আর কী ছিল। নুড়ি, পাথর, ঝিনুক, শামুক।

নেশাই যখন, তখন নেশাগ্রস্তের মতই আচরণ।...

দুপুরের বিশ্রামকালটুকুতে আর দোতলায় শোবার ঘরে উঠে আসেন না অম্লানকুসুম, টানাপাখার নীচে ধবধবে ফরাসে ছোট তাকিয়া মাথায় দিয়ে শুয়ে মন দিয়ে পড়ে চলেন, 'সরল হোমিও শিক্ষা'।

বিকেল হলেই তো বেরিয়ে পড়তে হবে ধুতি সেট পরে। পুরন্দর যাবে সঙ্গে সঙ্গে হোমিও বাক্সটা হাতে নিয়ে। এখন দুপুরে তার আসল কাজ, টানা পাখা টানা।

অম্লানকুসুম সীলিঙের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে যান, ঠিক তেমনি লাল শালুর চওড়া ঝালর বানিয়ে দিয়েছে। শুধু শালুটা বড্ড নতুন বলে বেশী টুকটুকে।

হঠাৎ এক সময়—প্রভাতকুসুমের গলায় বলে উঠেন, ওরে, এবার তুই হাতের দড়ি ছেড়ে একটু জিরিয়ে নে। ভগবানের হাওয়া আসছে বেশ।

হ্যাঁ দুপুরে প্রভাতকুসুম।

গহনকুসুম এ সময় কোর্টে থাকেন।

বইটা পাশে রেখে অম্লানকুসুমও চোখ বোজেন। হয়তো জলের তলার মত ঘুমের তলায় তলিয়ে যান।…

মা বাবা, কাউকেই মৃত্যুকালে দেখতে পাননি। অম্লানকুসুম খবর পেয়ে চলে এসে মৃতদেহটা দেখেছেন—তাও বাবাকে ওর বাড়িতে, মাকে শ্মশানে।—ছোঁয়াচে অসুখ হয়েছিল, যত তাড়াতাড়ি বাড়ি ছাড়া করা যায়।

আর জ্যাঠামশাই? ডাক্তার প্রভাতকুসুম?

হ্যাঁ, তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

বাকরোধ হয়ে গিয়েছিল। আস্তে হাত তুলে আশীর্বাদ করেছিলেন।…নাঃ। কোন নির্দেশ আরোপ করে যাননি তিনি। কোন ভাবে কোন বাক্যদত্ত করে রেখে যাননি। বলেন নি 'অমুককে দেখিস।'…ইসারাতেও তো বলা যেত…সামনের দেওয়ালে টাঙানো জগদ্ধাত্রীর ছবির দিকে তাকিয়ে থেকেছিলেন নিষ্পলকে।…

সে ঘরটা ওই বৈঠকখানা ঘর নয়।…দোতলায় জ্যাঠামশাইয়ের শোবার ঘর।…

পাশের ঘরে ফুল্লকুসুমও তখন প্রবল জ্বরে শয্যাগত। তবু পরদিনই চলে আসতে হয়েছিল অম্লানকুসুমকে। তার পরদিনই বি. এ. একজামিন শুরু।

বেচারা ফুলু, তার সে বছরটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ফুলু বহরমপুরেই পড়তে গিয়েছিল, পিসিমাহীন পিসের বাড়িতে।…বাপ মারা যাওয়া ভাই-বোনকে মামার বাড়িতে রেখে আসা, এইসবে তার পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। তারপর কখনো কখনো ছাড়া ছাড়া খবর, কখনো বিজয়া দশমীতে একটা পোস্টকার্ড, তারপর কোথায় কে। জ্যেঠি মারা যাওয়ার গঙ্গা মার্কা চিঠিটা পেয়েছিলেন কোথায় যেন ঘুরতে ঘুরতে কতদিন পরে। তারপর ফুলুকে একটা চিঠি দেব দেব করে দেওয়া হয়ে ওঠেনি, 'এতো দিন পরে কোন্ মুখে দেব' ব'লে। তাদের ঠিকানাও ঠিক জানা ছিল না, আশ্চর্য। মল্লিকদের বাড়িটা

সমেত সারা পাড়াটাই জলের তলায় তলিয়ে গেছে শুনে, আরও একবার তো দারুণ ইচ্ছে হয়েছিল 'চিঠি লিখি'। তাই বা কই লেখা হল ?···হঠাৎ একসময় মনে হয়েছিল ফুলু কি আমায় মনে রেখেছে ? তাছাড়া চিঠি দেবই বা কোন্ ঠিকানায় ?···কখনো কখনো লোকের মুখের উড়ো খবর, ফুল্লকুসুম মল্লিক কিসের যেন স্কলারশিপ পেয়ে বিলেত গিয়েছিল, পাশ করে এসে মধ্যপ্রদেশের কোথায় কী বড় পোস্টে আছে। ফুল্লকুসুমের কোন একটা ছেলে না কি হীরের টুকরো। সেও নাকি বিদেশে পড়াশুনো করছে। খবর যারা সাপ্লাই করেছে ওর বেশী আর এগোতে পারেনি তারা। অতএব কাকচক্ষুদীঘিতে শ্যাওলার ওপর শ্যাওলা জমে জমে নিথর পাথর হয়ে পড়ে থেকেছে। মনে হয়েছে এই উচ্চপদে অধিষ্ঠিত, স্ত্রী পুত্র পরিবৃত অম্লানকুসুম মল্লিকই সত্য।

···তবে ?

হঠাৎ সেই পাথুরে শ্যাওলার স্তর ভেদ করে অম্লানকুসুম নামের লোকটার শৈশব বাল্য কৈশোর উঠে এল কেন ? কী করে ? ওরা উঠে আসার সঙ্গে সঙ্গে যে উঠে আসছে কত মুখ কত চাহনি, কত ভঙ্গী, কত হাসির টুকরো।···আর আসছে হঠাৎ হঠাৎ এক একটা দরাজ কণ্ঠস্বর···তবে এই হঠাৎ উঠে আসা জিনিসগুলোকে জায়গা দেবেন কোথায় অম্লানকুসুম ?···তাদের তো একটা আধার চাই। সেই আধারটাকে খুঁজতে গিয়েই তো জলের তলায় তলিয়ে যাওয়া।···

অথচ হয়তো বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডের লতুদির বাড়ির পাশের সেই একলাখ আশীহাজার টাকার ফ্ল্যাটটা কিনে ফেললে এসবের কিছুই হতোনা।···যেমন হয়নি ভাল ভাল সরকারি কোয়ার্টার্সে থাকতে।—বেগুসরাই, লাহেরিয়া সরাই, ডালটনগঞ্জ, লাতেহার, আরো কত কত জায়গা, সে সব জায়গায় তো গাছপালা কুঁড়ে বাড়ির অভাব ছিল না ?—ছিল না বটে, তবে অভাব ছিল স্মৃতিবোধের।

যেন জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুর ঘোষণার মত সংসার গুছিয়ে বসা।

ঘরবাড়ি সাজিয়ে গুছিয়ে বসবার সাধকে শিপ্রার শুধু ঠেলে ঠেলেই রাখতে হয়েছে।···বিয়ের সময় পাওয়া খাট বিছানা আয়না আলনাগুলো পর্যন্ত চিরকাল শিপ্রার বাপের বাড়িতেই পড়ে থেকেছে।

লতুদির পাশের ফ্ল্যাটটায় একসঙ্গে নগদ ধরে দিতে হতোনা, ইনস্টলমেণ্টের অবকাশে গাড়িটা হয়ে যেত। শিপ্রার আর তার ছেলে-মেয়ের সারা জীবনের স্বপ্ন সফল হতো।···আর হয়তো অম্লানকুসুম নামের লোকটা সেই সফলতার শরিক হয়ে বাকি জীবনটা সুখে নিশ্চিন্তে কাটিয়ে দিতে পারতো।···

কিন্তু কোথা দিয়ে যে কী ঘটে!

যে শিপ্রা জন্মজীবনে কখনোই অম্লানকুসুমের সুপরামর্শে কান দেওয়াটা প্রয়োজন মনে করেনি, হঠাৎ বালীগঞ্জ ছেড়ে, গোড়ে'য় চলে আসতে রাজী হল, আশ্চর্য বৈকি। কাগজে কলমে 'গড়িয়া স্টেশন।' লোকের মুখে মুখে তো 'গোড়ে'।···

অবশ্য এই স্টেশনে ট্রেনে চেপে বসলে চটপটই বালীগঞ্জ স্টেশনে চলে যাওয়া যায়। তাতে কী? নামটা তো বিশ্রী গাইয়া। তথাপি রাজী হয়েছিল শিপ্রা। হয়ত লতুদির আমেরিকা চলে যাওয়া দেখে বিষাদে। হয়তো বা ভেবেছিল, লতুদির ঘর বোঝাই হয়ে উঠবে 'ফরেনে'র মালে, আমি কি বরাবর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠতে পারবো? তার থেকে দূরে থাকাই ভালো।···'খোলামেলা জায়গায়' বাড়ি সেটাও এক ধরনের আভিজাত্য! হয়তো এ আভি-জাত্যের জোরে লতুদির তিনঘরা ফ্ল্যাটের মধ্যে খানিকক্ষণ বসতে হলে শিপ্রার প্রাণ হাঁপাতেও পারে।···অতএব শিপ্রার স্বপ্ন সাধ ত্যাগ।

অতএব অম্লানকুসুমের উপরে বর্তে গেল আপন স্বপ্ন সফলের দায়।....সেই দায়ে অম্লানকুসুমকে গিন্নীর গঞ্জনা সয়েও কলকাতা শহর চষে এনে এনে জড়ো করতে হচ্ছে অদ্ভুত অদ্ভুত সব জিনিস।

যেগুলো সাজিয়ে সাজিয়ে রাখতে হচ্ছে, স্মৃতি বিস্মৃতির সমুদ্রে ডুবুরি নামিয়ে নামিয়ে। আর সেই দায়েই অম্লানকুসুমকে দুপুরে দোতলার ঘরের ফুলফোর্সে খোলা পাখার নীচের খাট গদির বিছানা ছেড়ে একতলার ঘরে কাঠের চৌকীর উপর ঢালাও ফরাসে তাকিয়া মাথায় দিয়ে টানা পাখার নীচে শুয়ে 'সরল হোমিও চিকিৎসা' পড়তে হচ্ছে।

এবং—এবং বিকেল হলেই উঠে পড়ে বলতে হচ্ছে, পুরন্দর ওঠ বাবা। বেরোবার সময় হয়ে গেল।

কে মাথার দিব্যি দিয়েছিল অম্লানকুসুমকে, 'ওহে অম্লানকুসুম, এখন তুমি আরামকে হারাম করে, ওই এবড়ো খেবড়ো মেঠো পথে বেরিয়ে পড়ো। বেরিয়ে পড়ে খুঁজে পেতে দু চারটে হাড় জিরজিরে দুঃখী গরীবকে জোগাড় করে ফেলো।...আর সেই সব বেজার বিরক্ত কথাটি পর্যন্ত কইতে অনিচ্ছুক ব্যক্তিদের অথবা মহিলাদের, অথবা তাদের সন্তানদের ধরে জোর করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে বিনি পয়সায় ওষুধ বিলোও।'

ভগবান জানেন কে মাথার দিব্যি দিয়েছে। তবে লোকগুলো যে বেজার বিরক্ত আর অনিচ্ছুক তা তো জানতে বাকি নেই অম্লানকুসুমের।...

তাদের মুখ চোখ দেখলেই তো বোঝা যায় অম্লানকুসুমের এই হত করতে আসাটা তাদের অশেষ বিরক্তিকর।

হবে নাই বা কেন? কে চায় তোমার এই রাস্তায় ঘুরে ঘুরে চোর ধরার মত রুগী ধরা? আর যেচে সেধে তাদের চিকিৎসা এবং বিনি পয়সার ওষুধ?

তার উপর আবার দাঁড় করিয়ে রেখে গুচ্ছের উপদেশাবলী।...না না, ও সব কেউ চায় না।...কেউ চায় না, তুমি নিজের চরকায় তেল দেওয়া বাকি রেখে পরের চরকায় তেল দিতে আসবে?

পুরুষগুলোকে ধরা মুস্কিল, কিছু জিগ্যেস করতে গেলেই অগ্রাহ্য করে উত্তর দেয়। তাদের শরীরে কিছুমাত্র অসুখ আছে তা

স্বীকার করতে রাজী হয় না, হয়তো বা মুখের উপর শুনিয়ে দিয়ে যায়, রোগব্যামো হলে হাসপাতাল তো রয়েছে বাবু।

আর মেয়েগুলো?

অম্লানকুসুম দূর থেকে আসতে দেখলেই তাদের কোলের, কাঁখের, সঙ্গের, নাকে পোঁটা পড়া, পেটে ঘুনসি বাঁধা, গায়ে খোস-পাঁচড়া ভর্তি ছেলেমেয়েগুলোকে সামনে নিয়ে বলবে, চ, চ, ঘর চ। আসতেছে তিনি। এক্ষুনি সাত সতেবো কতা কয়ে মাতা ধইরে দেবে।

আর, বাসনমাজা, কি কাপড় কাচা অবস্থায় ধরা পড়ে গেলে, পালাতে না পারলে, নিমপাতার নির্যাস গলায় ভরে বলবে, বালাই ষাট। রোগব্যামো শত্তুরের হোক। দুঃখীর ঘরে, অভাবই ব্যাধি। পেটপুরে খেতে না খেয়ে 'ওগা'।

আর যদিও বা কেউ দাঁড়িয়ে শোনে, অম্লানকুসুমকে কৃতার্থ আর পুলকিত করে একটু রোগ বিবরণ দেয়, তো বোদা অনাসক্ত মুখে ওষুধটা নিয়ে আঁচলে বেঁধে বলে, ঘরে গে খাওয়াবো।

এখনই খাইয়ে দাও না বাছা!

এখেনে জল কোতা?

কিন্তু ওর গায়ে বেশ জ্বর রয়েছে।

ওর অমনিতর ধাত বাবু। ওদে ঘুরলেই গা তাতে।

তা রোদেই বা ঘুরতে দিচ্ছ কেন? ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে রাখো।

গরীবের কি আর ছেলে কোলে নে' ঘরে বোস করে থাকলে চলে বাবু? আপনি মিথ্যে মাথা ঘামিয়ে মরতেছেন।...চোখে কুটিল কটাক্ষ।

এখানে এরা ছোট বড় মেজ সেজ সর্ববিধ প্রাকৃতিক কাজই পথে ঘাটে সর্বসমক্ষে সমাধা করে। চিরকাল করে আসছে, হয়তো চিরকালই করবে।...

শহরে রাশি রাশি ষোলো তলা আঠারো তলা পাঁচশ তলা বাড়ি উঠবে, পাঁচ তারা সাত তারা হোটেল গজাবে, মোড়ে মোড়ে সিনেমা হল হবে, আর হয়তো তারই অতি অনতি-দূরে, শোভন সুন্দর ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে থাকা অভিজাত নরনারীর চোখের সামনে ঘটে চলবে এইসব অবশ্যকরণীয় কাজগুলো।

একটা পেট ডিগডিগে ছেলের বমির ছিটেয় অম্লানকুসুমের ধুতি সেট জখম হয়ে গেল, তবু অম্লানকুসুম ব্যস্ত হয়ে তার মাকে বললেন, এ তো সাংঘাতিক অবস্থা দেখছি বাপু, শীগগির এই ওষুধটা খাইয়ে দাও।

ওষুধ খেয়ে আর কী হবে?···মা ছেলেটার পিঠে ধাঁই ধপাধপ কয়েক ঘা বসিয়ে দিয়ে অগ্রাহ্যভরে বলল, দিনভোর কাঁচা কুল গিলে মরচে, বমি হবেনি।

হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে সামনের পচা পুকুরে চুবিয়ে তুলে আরো এক ঘা বসিয়ে রুদ্র মূর্তিতে বলল যা ঘরে যা।

তার ভাব দেখে মনে হল, নির্দেশটা শুধু নিজের ছেলেকেই নয়।

বাক্সবাহী পুরন্দর গজ গজ করতে করতে বলে আপনার যেমন খেয়ে দেয়ে কাজ নাই বাবু, তাই এক অমানিষ্যিদের হিত করতে এয়েচেন। য্যাতো সব মুখ্যুর ডিম।

অম্লানকুসুম হাসেন, ওইতো! গলদ তো ওইখানেই।

তা এটা তাঁর কাছে একেবারে অপরিচিত নয়।

প্রভাত ডাক্তারও যখন পথ চলতে মাঠেঘাটে ঘুরে বেড়াতেন ছেলেমেয়েগুলোর দিকে গোয়েন্দার দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন, ছেলে-মেয়েগুলো এই বলে ছুট মারতো, 'ওইরে, ডাকদার বাবু এসতেচে। ···এক্ষুনি পেট টিপবে, জিব দেকবে, আর বুকে সাঁড়াসি ঠুকে বলবে, ভাত বন্দ। ঘরে শোয়া করে থাকগা।'

এখনকার এরা আরো সরেশ। জিভ দেখাতে বললে জিভ ভেঙিয়ে পালায়।

'রোদে ঘুরিসনে', বললে বুড়ো আঙুল দেখায়।

পুরন্দর বলে, বাবু আপনার অসীম ধৈর্য্য।

তবু একদিন সেই ধৈর্য্যে চিড় খেলো।

জ্ঞান হারালেন অম্লানকুসুম।

দূর থেকে দেখতে পাচ্ছিলেন, বুঝতে পারেননি ছেলেটা করছে কী?—চলে এলেন।

কাছে এসে দেখতে পেলেন ছেলেটা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিজেকে ঘিরে, ঘুরে ঘুরে একটা জলের বৃত্ত রচনা করছে, আর সামনে দাঁড়ানো একটা ছেলের দিকে তাকিয়ে দাঁত বার করে হাসছে।

নেহাৎ অবোধ শিশু নয়, বছর আট নয়ের ছেলেটা।

দেখে মাথা থেকে পা অবধি জ্বলে গেল অম্লানকুসুমের। দ্রুত চলে এলেন, চড়া গলায় বললেন, এই, রাস্তার মাঝখানে পেচ্ছাপ করছিস কেন?

মুহূর্তে সেই হাসির দাঁত খিঁচিয়ে উঠল, উদ্ধত গলায় জবাব এল, বেশ করছি। তোর বাবার রাস্তা?

হ্যাঁ, সহসা জ্ঞানই হারালেন চিরসহিষ্ণু চিরশান্ত মানুষটা।—'কী বললি?' বলে লাল লাল মুখে আর একটু এগিয়ে এসে ঠাশ করে একটা চড় বসিয়ে দিলেন ছেলেটার গালে।

হয়ত অনভ্যাস বলেই একটু বেশী জোর হয়ে গেল।

ব্যস। সঙ্গে সঙ্গে যেন অশনিপাত হল। কুকীর্তিরত দুটো ছেলে 'মেরে ফ্যালালে, মেরে ফ্যালালে' বলে এমন পরিত্রাহী চীৎকার করতে করতে গৃহপানে ছুটতে লাগলো, শুনলে মনে হতে পারে ছুরি খেয়েছে কি লাঠি খেয়েছে।

যে ছেলেটা দর্শক মাত্র ছিল, তার গলাটা বোধকরি বেশী জোরালো। তার ভাষা 'বুনোরে মেরে ফ্যালালে'।

আশ্চর্য। চারিদিক তাকিয়ে পুরন্দরকে কোনো দিকে দেখতে পেলেন না অম্লানকুসুম। ওষুধের বাক্স সমেত গেল কোথায় লোকটা?

বিরক্ত হয়ে ফিরে এলেন।

দেখলেন, বাড়ির দরজার কাছে বাক্স কোলে নিয়ে বসে।

এখানে বসে আছিস যে?

আজ্ঞে বাবু মাতাটা কেমন ঘুরতেচে। তাই চলে এলাম।

কখন ঘুরলো?

উই শেতলা মন্দিরের কাচ বরাবর গেচি, আর মাতাটা নাট্টুর মতন ঘুরে উটলো।

মুখে আসছিল, তোর আবার কী দেখে মাথা ঘুরলো। আমারইতো—

বললেন না।

গল্প করবার মত কাহিনী নয়।

কিন্তু ছেলে দুটোর সেই পরিত্রাহী আর্তনাদের তীব্রতা যেন কান থেকে মিলোচ্ছে না অম্লানকুসুমের। বরং কান থেকে মাথায় পৌঁছে গিয়ে ধাক্কা দিচ্ছে।

বেটক্করে রগেটগে লেগে গেলনা তো?

তা নইলে অমন চেঁচাবে কেন?

একটাই মাত্র চড় তো।

তবে বরাবর শুনে আসছেন অম্লানকুসুম বে-আন্দাজী থাপ্পড়ে রগের শির ছিঁড়ে মৃত্যুও ঘটে যেতে পারে।

আশ্চর্য। আজই হঠাৎ পুরন্দরের মাথা ঘুরল। ও যদি প্রত্যক্ষদর্শী হতো, হয়তো ছেলেটাকে চিনতে পারতো। খোঁজ নিয়ে জেনে আসতে পারতো কেমন আছে ছেলেটা।

তবে বেশীক্ষণ উদ্বিগ্ন থাকতে হল না অম্লানকুসুমকে। খবর বাড়ি বয়ে চলে এলো।

ঘণ্টা দুইও কাটেনি গেটের সামনে জনারণ্য। বহু কণ্ঠের কলরোবের মধ্য থেকে একটা একটা আস্ত কথা ছেঁকে উঠে আসছে, বেরিয়ে আসুন। বেরিয়ে আসুন একবার।—

গরীবের পাড়ায় অট্টালিকা হাঁকিয়ে ভেবেছেন সবাই ওনার প্রজা। —জমিদারের ছুতো করে মেয়েছেলের ঘাটে পথে ঘুরঘুরনি। বুঝিনা কিছু ?

আর এরই মাঝেখানে একটা তীব্র তীক্ষ্ম নারীকণ্ঠ, 'ছেলেডারে একেবারে জকম করে দিলে গো। গালে পাঁচ আঙুলের দাগ বইসে গ্যাচে।'—

পাঁচ আঙুলের দাগ বসে গেছে। মাত্র এই।

এতো অপমান, এতো অকথ্য গালাগাল তবু তার মধ্যেও অম্লান-কুসুমের বুকের মধ্যে একটি পরম শান্তির হাওয়া খেলে যায়!

না। আর কিছু না।

পাঁচটা আঙুলের পাঁচটা দাগ মাত্র।

ওই লোকারণ্যের ঝড় যখন গেটের উপর এসে আছড়ে পড়েছিল তখন তো অম্লানকুসুম চরম দণ্ডের জন্যই প্রস্তুত হচ্ছিলেন। ঈশ্বর রক্ষা করেছেন, ছেলেটা মরেনি।

কিছুক্ষণ পরেই অবশ্য ভীড় পাতলা হয়ে এল।···পরের গোয়ালে কে কতক্ষণ ধোঁয়া দেবে ?

—যাতে সব চীৎকারের নিষ্পত্তি ঘটে, সেটাও তো হয়ে গেল।

বড় মানুষ কর্তা রাস্তায় বেরিয়ে এসে হাতজোড় করে বললেন, আমার অন্যায় হয়েছে বাবারা। ছেলেটা রাস্তার মাঝখানে অকর্ম করছিল দেখে মেজাজটা ঠিক রাখতে পারিনি। বয়স হয়েছে তো! বয়েসের দোষ। আটান্ন বছরের লোকটা স্বীকার করল বয়স হয়েছে।

আর বড় মানুষের গিন্নী, তিনি স্বয়ং নেমে এসে বললেন, কই বেচারীর মাকে একটু ডাকোতো দেখি। এই যে—দেখো বাপু ছেলে-

পুলে দুষ্টুমী করলে মা বাপও তো চড়টা চাপড়টা দেয়। কিছু মনে কোরোনা মা, তোমার ছেলে মার খেয়েছে, এখন একটু সন্দেশ খাক।

এগিয়ে এসে ছেলের মায়ের প্রসারিত হাতে ধরিয়ে দিলেন একখানা একশো টাকার নোট।···

মা কি তবে তৎক্ষণাৎ বাড়ির গিন্নীকে একটা প্রণাম ঠুকলো?··· না কি এক গাল হেসে বলল, 'চড় খেয়ে তো তোর ভালই হলরে বুনো, নে কত সন্দেশ খাবি খা।'

পাগল। এ কী মধ্যযুগ না কি?

বিনা বাক্যে নোটটা আঁচলে বেঁধে ছেলের হাতটা ধরে গটগটিয়ে চলে গেল বুনোর মা।

এরপর আর ভীড় ছত্রভঙ্গ হবে নাতো কী হবে?

টুকরো টুকরো কথা, স্বপক্ষে বিপক্ষে মন্তব্য আস্তে আস্তে ফাঁকা। যে মস্তান ছেলে দুটো তখন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছিল, 'এই সব মানুষের চামড়া ছাড়িয়ে নিয়েই গরীবের জুতো বানাতে হয়, তারাই ফ্যাক ফেকিয়ে হাসতে হাসতে বলতে বলতে চলে গেল, 'এমন মধুর পরিণাম জানলে গাল বাড়িয়ে এক ঘা চড় চেয়ে যাওয়া যেতো, কী বলিস মাইরী।'

এখানে রাস্তায় আলো আসেনি।

খানিক পরে সেই জনাকীর্ণ জায়গাটা অন্ধকারে একটা থমথমে শূন্যতায় নিঃসাড় হয়ে পড়ে রইল। যেমন নিঃসাড় হয়ে যায় কোনো গেট থেকে শবদেহ বার করে নিয়ে যাবার পর গেটের বাইরেটা।

তবে এর পরেও অনেক অকথ্য কথা শুনতে হল বৈ কি অম্লানকুসুমকে।

হবে না?

বাড়ির লোক ওঁর জন্য যে অপমান সহ্য করেছে তার শোধ নেবে না? ধিক্কারে ধিক্কারে বিদীর্ণ করে দেবে না অম্লানকুসুম নামের একটা নির্বোধ ভাবপ্রবণ লোকের অবিমৃষ্যকারিতাকে?

উনি ওনার জ্যাঠামশাই হতে গিয়েছিলেন! বাড়িতে জঙ্গীপুর প্রতিষ্ঠা করছিলেন। হল তো শিক্ষা? তবু কিছু টাকার ওপর দিয়ে মিটল তাই, ছেলেটা মরেফরে গেলে কি হতো? যেভাবে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ওরা, আমি তো ভাবলাম ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটে গেছে।...চিরকালের উঁচু মাথাটা কী হেঁট হওয়া! ছি ছি!

ছেলে কাটা কাটা ভাষায় বলে গেল, মিটে গেছে বলে নিশ্চিন্ত হবার কিছু নেই।...ওরা আবার আসতে পারে ব্ল্যাকমেইল করতে। কিছুদিন সাবধানে থেকো, রাস্তায় একটু কম বেরিও।

মেয়ে অবশ্য তেমন কিছু বলেনি। সে সেই থেকে 'বাপী কখনো মারেনি' বলে কেঁদেই চলেছে।...নেহাত লবঙ্গ ছিল তাই রাত্রে খাওয়াদাওয়া হল।

বুনো নামের সেই পাজী ছেলেটা মরেনি, এতো সহজে মরেও না ওরা। তার গালের দাগও অবশ্যই রাতারাতি মিলিয়ে যাবে, কিন্তু অদৃশ্য অন্তরালে একটা অপঘাত মৃত্যু ঘটে গেল।...মৃত্যু ঘটে গেল একটা বিশ্বাসী ধারণার। মৃত্যু ঘটল একটা নিঃশঙ্ক আনন্দময় যাত্রাপথের।...

তবু পায়ের তলার একটুখানি মাটি।

পুরন্দর।

অম্লানকুসুম বলেন, আর কতক্ষণ দড়ি টেনে মরবি পুরন্দর? বিকেল গড়িয়ে গেছে, হাওয়া আসছে, ছেড়ে দে। এখন তো তেমন গরমও নেই।

পুরন্দর ঘুম জড়ানো গলায় বলে, আপনি ঘুমান তো বাবু, 'টই টই' করে ওষুধ বয়ে পতে ঘুরতে যেতেছেন না, নিচিচন্দি হয়ে ঘুমান। বড় স্নিগ্ধ স্বর।

ঘুমও আসেনা, নিশ্চিন্ত হওয়াও যায়না। শুধু আনন্দহীন উৎসাহহীন একটা গভীর শূন্যতার মধ্যে তলিয়ে থাকা।

আচ্ছা, পৃথিবী কি চিরদিন এইরকমই নির্লজ্জ ছিল? শুধু আমারই চোখে ছিল রঙিন চশমা? মানুষ কি বরাবর এই রকমই হিংস্র ছিল, শুধু আমারই অনুভব ক্ষমতা ছিল না?

এক সময় উঠে আসেন, পুরন্দর ঘরটা বন্ধ করে দিস, ব'লে। ···বিলু এসেছে খড়্গপুর থেকে ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়ে, বাড়ির আবহাওয়া কিছুটা উল্লসিত।

এই সময় কথাটা পাড়ল শিপ্রা। বিলুর জন্যে ব্যাপারটা আটকে রেখেছিলাম এতো দিন। গৃহপ্রবেশে তো কাউকেই বিশেষ ডাকতে পারিনি, এবার একবার সবাইকে ডাকবো।

এই 'ডাকবো' শব্দটার মধ্যে বেশ একটা সমারোহের আভাস বার্তা ছিল। অর্থাৎ যেন বেশ অনেককেই ডাকবেন। ভাল আয়োজনই করবেন।

এতোদিন পরে গৃহপ্রবেশ?

বাঃ তখন কী বা করতে পেরেছি?

তা বিলুর পাশের খবরের পর করলেও হয়।

বিলু বলল, ক্ষেপেছ। যা করবে, রেজাল্ট বেরোবার আগেই করে নাও।

অতঃপর সেই কুটিল কথাটি উচ্চারণ করল শিপ্রা।···দেখো তো পাশবইটা! তোমার যাদুঘরের উদ্ধৃত্ত, শেষ তলানি কী আছে-টাছে। আমার একটু বেশী চাই কিন্তু। ড্রইংরুমের জন্যে একটা কার্পেট দেখে এসেছি সেদিন বেবির সঙ্গে গিয়ে, শ'আষ্টেক টাকা লাগবে। ওটা এই পার্টি'র আগেই নিয়ে আসতে চাই। তাছাড়া পার্টি'র খরচ তো আছেই।

অম্লানকুসুম হঠাৎ ভাবতে শুরু করেন, আচ্ছা ওই ঘরটাতেই যা কিছু এনে এনে জড়ো করেছি, সেগুলো বেচে দিলে কতটা উঠে আসতে পারে?···ঘরটায় ঢুকে চারদিক তাকিয়ে ভেবে পেলেন না

অনেক জায়গা থেকে আহরণ করে আনা এই সব তুচ্ছ জিনিসগুলিকে কোথায় বেচতে পারা যায় ? কে কিনতে পারে ?

নিজের উপর কেমন একটা ধিক্কার আসছে। আসছে লজ্জাও। তবু ওই ঘরটা কী এক আকর্ষণে টানতে থাকে। গিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকেন। 'সরল হোমিও শিক্ষা' আর পড়াও হল না, 'গৃহ চিকিৎসার বাক্সটা' দেওয়াল আলমারীর মধ্যে মোটা মোটা কিছু বইয়ের পাশে বসে থাকে দিনের পর দিন।

অম্লানকুসুম তাকিয়ে থাকেন জানলার বাইরে। কী কী যেন গাছ পুঁতেছে পুরন্দর, তারা কিছুটা শাখাপ্রশাখা মেলে আকাশে হাত বাড়াবার স্বপ্ন দেখছে।...অদ্ভুত একটা ঘটনা, সহসাই লক্ষ্য পড়ছে, অম্লানকুসুমের জমিটা ছাড়িয়ে ঠিক প্রান্তসীমায় একটা সজনে গাছ। সে তার তেঁতুল পাতার মতই সদানর্তনশীল পাতার ঝিরঝিরানি নিয়ে বাতাসে দুলছে। অম্লানকুসুম অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন, ওটা কী করে হল ?

অম্লানকুসুম নিরুৎসাহে ঝিমিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু শিপ্রার এখন দারুণ উৎসাহ।

নতুন কার্পেট এসে গেছে। শিপ্রার তাই উৎসাহের জোয়ার।

দেয়ালে টাঙানো তামার থালা, কাটা কুলুঙ্গীতে সাজানো পিতলের পুতুল, এদের সব নামিয়ে নামিয়ে ব্রাসো ঘসে চকচকে করা হচ্ছে, সোফার ঢাকা বদলানো হচ্ছে, হচ্ছে আরো কত কিছু।

লবঙ্গই ডান হাত।

লবঙ্গই পরামর্শদাত্রী। এখন আর লবঙ্গ বাসন মাজেনা, সে কাজটার জন্যে একটা ঠিকে লোক রাখা হয়েছে।

লবঙ্গ।....লোক তো প্রায় জনা পঁচিশ হয়ে যাচ্ছে, পারবি তো ? না একটা রাঁধুনী ঠাকুর ডাকব ? তোর ভারী হয়ে যাবে।

লবঙ্গ অবলীলায় বলে, মাসীমা যে কী বলেন, পঁচিশ তিরিশ

জনের রান্না আবার কী এতো ভারী ?—রাঁধুনীরও দু হাতে দশটা আঙুল, লবঙ্গরও তাই।

বাঁচলাম বাবা। সবাইকে গল্প করি তোর রান্নার মহিমা নিয়ে।

এখন এই দু দিন ওই রবিবারের পার্টি ছাড়া অন্য কোন প্রসঙ্গই নেই শিপ্রার আর তার মেয়ের।

অবশেষে এল সেই দিন।

একে একে এসে পৌঁছুতে লাগলেন, শিপ্রার দিদি জামাইবাবু, বোনপো বোনঝি, জামাইবাবুর ভাইপো ভাইঝি।...এসে পৌঁছয় ছোট বোন রেবার গুষ্টিবর্গ। আসেন শিপ্রার মামাতো ভাই, ভাই-বৌ, আসেন কাকা কাকী।...

শিপ্রাই সব। অম্লানকুসুম কেউ না।

তা সেটা শিপ্রার দোষ নয়।

অম্লানকুসুমের যদি তিনকুলে কেউ না থাকে ? আর থাকলেও আসা যাওয়া রাখে কেউ ?

অম্লানকুসুম মৃদু হাসেন, তার মানে ? আমার স্ত্রী পুত্র কন্যা ?

আহা। আমরা কি গেস্ট ?

তা বটে।

তবে হ্যাঁ, হি হি, তোমার নিজস্ব নিমন্ত্রিত একজন আছে বটে।

কে রে ?

কেন পুরন্দর।—তোমার প্রাণের পুষ্যিপুত্তুর। তোমার দেশোয়ালী ভাই '

লবঙ্গকে নিয়ে মা'কে এবং পুরন্দরকে নিয়ে বাবাকে ঠাট্টা করা বিশেষ মজা বেবির।

অতিথিবর্গের প্রথম আগমনের উদ্দাম কলরোলের ঢেউ থিতোলে সবাই একবার করে বলে ওঠে, কই এ বাড়ির কর্তার সেই 'বৈঠকখানাটি, কোথায় দেখে আসি।...

অম্লানকুসুম প্রথমটা বলেছিলেন, মাথা খারাপ? দেখবার আবার কী আছে? মফস্বলি প্যাটার্ণে একটা ঘর রেখে দিয়েছি। আর কিছুই না।

ও'রা হৈ হৈ করে উঠলেন, বললে শুনবো কেন? শিপ্রাদি বলে, ওই ঘর নিয়েই পড়ে থাকেন আপনি। ঘরটা নাকি ওনার সতীন। রাতদিন তার সাজসজ্জা আসছে।

যাও দেখে এসো। হতাশ হলে আমার দোষ নেই।

বলেছিলেন অম্লানকুসুম। তবে এভাবে যে সবাইকে হতাশ করবেন তা কে ভেবেছিল? ঘর দেখে মিইয়েই গেল সবাই।—

শিপ্রা! তবে যে বলিস ওই একটা ঘরের পিছনে জলের মত খরচ করেছে অম্লান, টাকাকে টাকা-জ্ঞান করেনি। কোথায় কী? ওমা!...

ওমা শিপ্রাদি, খুব ব্লাফ্ দিতে পারো বটে। এই নাকি তোমার বর কলকাতা শহর চষে বেড়িয়ে আর ট্যাক্সীর আদ্যশ্রাদ্ধ করে কেবল ঘর সাজাবার জিনিস এনে বোঝাই করেছে। সাজের মধ্যে তো একখানা ঢাউস চৌকীতে পাড়াগাঁয়ের মত শতরঞ্জি চাদর পাতা।

কীরে মেজদি, এই তোর সতীন? আহা কী ছিরি ছাঁদ। পাড়াগাঁয়ের বাড়ির মত মস্ত একখানা চৌকী আর গোটাকতক তাকিয়া, এই তোর বরের প্রেম?

অম্লানকুসুম যেন অবাক হয়ে তাঁর দীর্ঘদিনের বিবাহিতা স্ত্রীকে নতুন করে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেন।

এই অদ্ভুত প্রচার কার্য চালিয়ে যাওয়া কি চাল ফলানোরই একটা অনুসঙ্গ? না সত্যিই অম্লানকুসুমের প্রতি এই হিংস্র বিদ্বেষ তার প্রাণাধিকা প্রিয়তমার?

অপ্রতিভ অম্লানকুসুম হন না, শিপ্রাই হয়। নিজেও সে দেখে অবাক হয়, সত্যি বাজে খরচের চিহ্ন কোথায়?...এতোদিন তবে কী করেছে মানুষটা?

অপ্রতিভ অবস্থা ঢাকতে, অতএব তাড়াতাড়ি খেতে ডাকে সবাইকে। সবাই একসঙ্গে বসে যাক বাবা। দূরের পাড়া।

নীচের তলায় এই ডাইনিং স্পেস্, অম্লানকুসুম যাকে কিছুতেই 'খাবার দালান' ছাড়া আর কিছু বলতে রাজী নয়, সেটা কম লম্বা নয়। সেখানেই টেবিলের পাশে নিত্য ডেকরেটারের দোকান থেকে ভাড়া করে আনা দুখানা টেবিল আর চেয়ার পেতে, খাবার সাজানো হয়ে যায়। মাঝে মাঝে ফুলদানীও।

পাশে একটা ছোট টেবিলে রান্নাকরা জিনিসপত্র।

পরিবেশনটা লবঙ্গ করতে পারবে না। কাকে কি দিতে হবে শিপ্রা বুঝুক।

এ বুদ্ধি কি আমার মাথায় আসতো ?

শিপ্রা সগর্বে ছেলেদের কাছে বলে, সবই লবঙ্গর পরামর্শ।···ওই তো নিজে পুরন্দরকে বলে টেবিল চেয়ার আনিয়ে সাজিয়ে ফেলল। তোদের এবার থেকে ওকে 'দিদি' বলা উচিৎ। ··জানেও এতো মেয়েটা।

তা'এই নতুন বাড়ির মত ওই লবঙ্গও শিপ্রার একটা দেখাবার বস্তু।....বাড়ি দেখে সকলেই আহা মরি করছে। এবং ফ্ল্যাটবাড়ির থেকে যে অনেক ভাল তা' স্বীকারই করেছে। যত দামী ফ্ল্যাটই হোক। নড়াচড়ার জায়গা কোথায় ?

বড় জামাইবাবু তো ঘোষণাই করে দিলেন, ফ্ল্যাটবাড়ি আবার বাড়ি ? পায়ের তলায় মাটি নেই।···

তা অবশ্যই নেই। কিন্তু জামাইবাবুর পুলিশ অফিসার ভাই যে হঠাৎ এভাবে শিপ্রার পায়ের তলার মাটি কেড়ে নেবে, তা' কে ভেবেছিল ? স্বপ্নে অথবা কল্পনায় ? না, কেউ ভাবেনি।

খেতে খেতে হঠাৎ গলা নামিয়ে প্রশ্ন করে বসলো সে, শিপ্রাদি, আপনার রান্নাঘরে যাকে দেখলাম, সে কে বলুন তো ?

আরে, ওই লবঙ্গ! যার কথা বলি। অবশ্য তোমাকে কি আর

বলেছি, তোমার বৌকে বলেছি। সে তো আমায় হিংসে করে। কিরে শুভ্রা, করিস না?

শুভ্রার বর আরো গলা নামিয়ে বলে, তা' উনি হয়তো হিংসে করতে পারেন আমি পারছি না। একটু নজরে রাখবেন, একটি পুরোনো পাপী বলে মনে হচ্ছে।

হেসে ওঠে শিপ্রা। জোরে জোরেই হেসে ওঠে, তোমাদের চোখের মধ্যেই সন্দেহের ছায়া। কী যে বল ভাই। ও একখানি রত্ন।

আমিও তাই বলছি, একখানি রত্ন। কোনো ছুঁতোয় ডাকুন তো একবার।

ছুঁতো আবার কী করবো? সবই তো এখানে বসিয়ে দিয়ে গেছে, মাংস, ফ্রায়েড রাইস, চপ, চাটনী, পুডিং, মিষ্টি, ডাল।··· আচ্ছা ডাকছি, তোমার সন্দেহ ঘুচুক। এই লবঙ্গ দুটো কাঁচালঙ্কা দিয়ে যাতো।···লবঙ্গ···কই রে? কী হল?···লবঙ্গ, মেসোমশাই কাঁচালঙ্কা চাইছে—কোথায় গেলি বাবা।

চঞ্চল হয়ে উঠে পড়ে শিপ্রা, কী হল? গেল কোথায়? গেলে তো সামনে দিয়েই যাবে।

না, কেবলমাত্র সামনে দিয়েই যাওয়া যায়, তা' নয়। রান্নাঘরের পিছন দিকেও একটা ছোট দরজা আছে, যেখানে নামলে বাসন মাজার জায়গা, কল, চৌবাচ্চা।

সেই দরজাটাই খোলা হাঁ হাঁ করছে।

কী সর্বনাশ! এই দরজা খোলা? কুকুর-বেড়াল ঢুকবে না? ....পুরন্দর, অ পুরন্দর, দেখ তো লবঙ্গ কোথায়? হঠাৎ কোথাও সে গেলটেল না কি!

কিন্তু পুরন্দরই বা কোথায়?

যে লোবটা সদাসর্বদা হুকুম তামিল করতে এক পায়ে খাড়া, ডাকলেই সাড়া? সে নেই।···কোথাও নেই। দু'দুটো মানুষ একসঙ্গে হাওয়া!

শিপ্রার বুক হিম হয়ে যায়।

শিপ্রা বসে পড়ে।

বসে পড়তে হয় ক্রমশঃ সবাইকেই।

কেবলমাত্র যে লবঙ্গকে আর তার বরকেই পাওয়া যাচ্ছে না তা তো নয়, পাওয়া যাচ্ছে না অনেক কিছুই। নিমন্ত্রিত মহিলাকুল তাঁদের নিজ নিজ ব্যাগবটুয়া, যাতে নাকি মাথা ধরার বড়ি থেকে চাবির গোছা পর্যন্ত সবই ছিল, সেই ব্যাগবটুয়াদের চিহ্নমাত্র নেই। শিপ্রার ঘরে নেই তাদের গায়ের সব থেকে শৌখিন আর দামী দামী স্কার্ফগুলিও। খাটের উপর রেখে এসেছিলেন সবই। আর নেই শিপ্রার যথাসর্বস্ব।

অতঃপর, দেখো দেখো কী কী নেই।

গড্‌রেজের লকারে গহনা নেই, ড্রয়ারে রাখা টাকা নেই, আলমারীতে তুলে রাখা শাল, স্যুট্, সিল্ক, বেনারসী নেই, ঘড়ি নেই, ক্যামেরা নেই, বিনুর স্যুটকেস নেই, টিটোর টেপরেকর্ডার নেই, শিপ্রার সংসারের মূল্যবান বস্তুর কিছুই নেই, আর কিছুই রইল না।

রইল না বিশ্বাস, ভালবাসা, নিশ্চিন্ততা।

রইল না মানুষকে 'মানুষ' বলে ভাববার দায়।

উৎসব বাড়িতে নেমে আসে যেন অনেক মৃত্যুর শোকছায়া।

শিপ্রার ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ করতে বসার চিন্তা কেউ করে না, নিজের নিজের ক্ষতির পরিমাণ অনুভব করে ক্ষিপ্ত, উত্তেজিত, ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ হয়ে বিদায় নেয় সবাই। কারণ রাত হয়ে গেছে অনেকটা। শহরের শেষ প্রান্তে বাড়ি করে মরেছে শিপ্রা।

পুলিশ অফিসার বলেন, একবার দেখামাত্রই আমার সন্দেহ হয়েছিল। অবশ্য বেটাছেলেটাকে দেখিনি, তবে ওই একজোড়া

মেয়ে-পুরুষের স্বামী-স্ত্রী সেজে এই পেশা আমার জানা। মেয়ে-ছেলেটাই ধুরন্ধর। কোনোভাবে কাজের ছুতোয় লোকের অন্দরে ঢুকে পড়ে কিছুদিন ধরে খুব গুণ দেখিয়ে মনোরঞ্জন করে। আর সততা দেখিয়ে বিশ্বাস অর্জন করে। তারপর বেটাছেলেটা ছল-ছুতো করে ঘনঘন দেখা করতে আসে,—আর তলে তলে—

দেখা করতে এসে ওতো এখানে কাজে লেগেছিল।

হা হা হা, তাই নাকি? তা'হলে তো কথাই নেই। তলে তলে চাবি হাতিয়ে, ছাঁচ করিয়ে, আলাদা চাবি বানিয়ে, ধীরে পাচার পর্ব। এটাই ওদের পদ্ধতি।

চাবি তো লবঙ্গকেই রাখতে দিতেন মা। ছাঁচ করার দরকার কী?···

অ্যাঁ। চাবিই রাখতে দিতেন? হা হা হা। তা'হলে তোমার মায়েরই একখানা ছাঁচ তুলে রাখো বাবা। এমন তো আর দুটি হবে না? হা হা হা।

শিপ্রার দিদি তাঁর পুলিশ অফিসার দ্যাওরকে একবারও অনুরোধ করেন না, ছোট বোনটার এই সর্বস্ব হারানো ক্ষতির বেদনা স্মরণ করে, সে যেন তার পুলিশীশক্তির সর্বশক্তি নিয়োগ করে। না, সে অনুরোধ করে না। বরং মনে হয় যেন দিদি মনে মনে উচ্চারণ করছে, বেশ হয়েছে। খুব হয়েছে। যেমন নিবুদ্ধির ঢেঁকি, তবে শুধু তো নিজেরই খোয়ায়নি। আমাদেরও সর্বনাশ করেনি? কে বলেছিল তোকে সপরিবারে আসার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাতে?

খালি বাড়িতে টাকাকড়ি রেখে আসা সমীচীন নয় বলেই না দিদি সংসারের যাবতীয় টাকাকড়ি, ঘড়ি, আংটি, বটুয়া ভরে নিয়ে এসেছিলেন এবং সমস্ত চাবি। এখন তালা ভেঙে বাড়ি ঢুকতে হবে।

এতেও বোনের ওপর রাগে হাড় জ্বলবে না?

যাবার সময় অম্লানকুসুমকে বলে যান দিদি, খুব নেমন্তন্ন খেয়ে

গেলাম ভাই, চিরকাল মনে থাকবে। এখন তোমরা দরজা-টরজা গুলো ভাল করে বন্ধ করে শুয়ো।

পুলিশ অফিসারও বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, দরজা-টরজার ব্যাপারে কেয়ারলেশ হবেন না।···এইসব লোকেরা অনেক সময় কিছু যদি নিয়ে যেতে না পারে, আবার ঘুরে আসে।

অম্লানকুসুম সে কথার উত্তর দিলেন না, শুধু আস্তে বললেন, ওই যে স্বামী-স্ত্রী সেজে বেড়ানো একজোড়া লোকের কথা বললে শিশির, ওই লোকটার নাম কী?

নাম? ওদের তো অষ্টোত্তর শতনাম। হা হা হা। বেচু, ওরফে মদন, ওরফে সুশীল, ওরফে জগন্নাথ, ওরফে বঙ্কুবিহারী, ওরফে ওরফে। একবার করে কিছুদিন গা ঢাকা দেয়, আর তারপরই নাম পাল্টে, ভোল বদলে দেখা দেয়। এখানে কী নামে ছিল?

একথার কোন উত্তর দেন না অম্লানকুসুম, শুধু বলেন, সবাই এক সঙ্গেই তো যাচ্ছো?

এটা কোনো প্রশ্নই নয়।

শুধু কথা বলার জন্যেই বলা।

কিন্তু কী'ই বা বলবেন আর? নামের পার্থক্য থেকে যদি মানুষ সম্পর্কে কোনো আশ্বাস খুঁজে পাওয়া যায়, এই আশাতেই তো নাম জিজ্ঞেস করা। কিন্তু একশো আটের মধ্যে কোথায় সেই আশ্বাসটিকে রক্ষা করবেন?

বৈঠকখানার চাবি পাঙ্খাবরদারের হাতে থাকাই বিধি, থাকতোও বিধিসম্মত ভাবে। সেই শেষদিনও সে হতভাগা সন্ধ্যা-বেলা তালা লাগিয়ে রেখেছিল।

ডুপ্লিকেট চাবি একটা থাকার কথা; কারণ তালাটা নতুন, কিন্তু

সেটা খুঁজে পেতে বার করে ঘরটাকে খোলবার সাহস হয়নি অম্লান-কুসুমের।

কে বলতে পারে খুললে আবার কোন একটা ভয়াবহ মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হবে হঠাৎ।

দরজাটা তাই দিন তিনেক ধরে বুকে তালা ঝুলিয়ে নিথর হয়ে পড়ে রয়েছে। যেমন নিথর হয়ে রয়েছেন ঘরের মালিক।

মানুষের এই অবিশ্বাস্য বিশ্বাসঘাতকতায় শিপ্রা প্রায় পাগল হয়ে গিয়ে, সারাক্ষণ চেঁচাচ্ছে, গালাগাল দিচ্ছে, মাথা খুঁড়ছে, চুল ছিঁড়ছে এবং শাপ-শাপান্ত করে চলেছে। মেয়েমানুষের অথবা মানুষের যতরকম দুর্দশা দুরবস্থা হতে পারে, তার সবগুলিই শিপ্রা তার একদা' প্রাণের পুতুলটির জন্যে বরাদ্দ করছে, কিন্তু অম্লান-কুসুম একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছেন।

দিন তিন চার পরে হঠাৎ একদিন চোখে পড়ল দড়িবাঁধা সেই চাবিটা দালানের দরজার পাশের পেরেকে যেমন ঝুলতো ঠিক তেমন ঝুলছে। তার মানে সেদিন থেকেই ঝুলছে।

চাবি রাখার এই পদ্ধতিটা পুরন্দরেরই।

বলা হয়েছে, ও কি রে দড়ি বাঁধছিস কেন?

আজ্ঞে বাবু এতে হারাবার ভয়টা কম। আর এই যে পেরেকে ঝুলে রইল প্রয়োজন হলে সবাই পাবে।

কত বুদ্ধি বিবেচনা ছিল।

জীবনের প্রারম্ভে ভুল পথে গিয়ে না পড়লে হয়তো এমনটা হতো না।

নিশ্বাস ফেলে চাবিটা পেড়ে নিয়ে প্রায় চোখ বুজেই তালাটা খুললেন অম্লানকুসুম, দরজাটা ঠেলে হাট করে দিলেন।

তারপর?

অম্লানকুসুম কি চেঁচিয়ে উঠলেন?

অম্লানকুসুম যে ভয়টা করছিলেন সেই ভয়ের মুখোমুখি হলেন?

না তো।

অম্লানকুসুম অবাক হয়ে গেলেন।

অবিকল যেমনটি ছিল, তেমনি আছে।

দেওয়ালের ক্যালেণ্ডারখানা পর্যন্ত ঝড়ো হাওয়ায় বাঁকা চোরা হয়ে যায়নি।

ফরাসের চাদরটা ফরসাই রয়েছে। নিজে থেকেই লোকটা সেই দিনই সব ফর্সা করেছিল, পাঁচজনা আসবে বলে।...অথচ শিশির বলে গেছে, কাজের ধরন দেখে বোঝা যাচ্ছে, আজকের এই গোলমালের দিনটিই ওদের টার্গেট ছিল।...গেস্টদেরও কিছু হাতানো হবে। বাকি অনেক কিছুই তো তলে তলে হাতিয়েছে দেখা যাচ্ছে।...

এই তিন চার দিন ধরেই তো শিপ্রার ডুকরে ওঠা শোনা যাচ্ছে, ওমা এটাও যে নেই ?...ওমা সেটাও গেছে।...

এ ঘরটা তবে এমন অবিকল রইল কী করে ?

শিপ্রা কপালে করাঘাত করে, আমার ভাগ্য। আমার সব গেল, আর তোর বাপীর সবটি আনটাচড্।

আহা বাপীর ঘরে আবার টাচ্ করার মত ছিল কী ?

হ্যাঁ তাই বটে। কিছুই ছিল না। কিছুই নেই।

অর্থহীন একটা নেশার ঘোরে অম্লানকুসুম একটা থিয়েটারের স্টেজ বানিয়ে ছিলেন তাহলে।...

চাদরটা ফরসা।

শুয়ে পড়লেন।

এখন বেলা দশটা মাত্র। খাবার ডাক পড়তে অনেক দেরী। ততক্ষণে একটু শুয়ে নেওয়া যাবে।...

এখন নতুন শীতের হাওয়া বইছে। টানাপাখার অভাব অনুভব হবে না।

বাপী!

এমা, সকালবেলা ঘুমিয়ে পড়েছ বাপী ?···ওঠো বাবু, দেখো তোমার কে এসেছে। গাড়িতে বসে আছে, তোমায় দেখে তবে নামবে।

সে আবার কী ?

পুলিশের ঝামেলা নয় তো ? অথবা সেই বুনোর ব্যাপারের জের ?

নাম বলেছে ?

হ্যাঁ। পি, কে, মল্লিক। এই যে কার্ড দিয়েছে। তোমার কেউ হতে পারে বাপী। দেখতে যেন তোমার ধরনের।

কিন্তু প্রগলভা বেবির এতো কথা কি শেষ পর্যন্ত শুনেছিলেন অম্লানকুসুম ?

কথা শেষ হবার অনেক আগেই তো ছিটকে বেরিয়ে পড়েছেন বাইরে।

গাড়িতে বসে আছিস তুই ? কার্ড পাঠিয়ে খবর দিয়েছিস। নেমে আয় বলছি।

তা' তারও শেষ অবধি শোনা হয়নি কথাটা, তার আগেই নেমে আসতে হয়েছে।

কী করবো বল ? সঠিক না জেনে কারুর বাড়ি ঢুকে পড়লেই হল ? দিনকাল জানিস না ?

তা হাড়ে হাড়ে জানি। উঃ ফুলু কতদিন পরে—

এই চোপ। দাদা না ?

আয় আয়, চল বসবি চল।

দাঁড়া বাবা, আগে একটু রেস্ট নিতে হবে। সিঁড়ি ওঠা আবার ডাক্তার ব্যাটাদের মানা।

কেন ?

কেন আর ? হৃদয় দৌর্বল্য। আরে, সামনে, সামনেই তো দিব্যি বসবার জায়গারে। একেবারে টেবিল সাজানো, ভাত বাড়া। অমু, এটা নিশ্চয় মেয়ে ? ওহে মা জননী বসে পড়বো ?

এতক্ষণে মা জননী একটি প্রণাম ঠুকে একগাল হেসে বলে, বসবেনই তো, আপনার জন্যই তো প্লেট রাখা রয়েছে।

আরে বাস, এ যে দেখি মহা ওস্তাদ মেয়ে। দেখি আমার জন্যে কী কী রেখেছিস। আর কী ছেলে মেয়েরে তোর অমু?

ওই তো মেয়ে, আর দুই ছেলে। তোর?

আমার তো কুল্লে একটা ছেলে। সে ব্যাটা আবার বিদেশে ডাক্তারী পড়তে গিয়ে প্রেমেফ্রেমে পড়ে একখানা সাহেবের মেয়ে বিয়ে করে বসে আছে।···তবে মেয়েটা বড় খাশা। খুব যত্নটত্ন করতো···ওদের কাছেই তো ছিলাম এতো বছর। বাড়িফাড়ি কিনে বেশ গুছিয়ে বসেছে তো ব্যাটা।

ফুলু তোর কথাগুলো ঠিক জ্যাঠামশাইয়ের মত লাগছে।

লাগবেই তো। জ্যাঠামশা'ই তো হয়েইছি।

প্রভাতকুসুমের মতই আকাশে শব্দ তুলে হেসে ওঠেন ফুল্লকুসুম মল্লিক।

এদের মা?

আছে। আপনার ভাইরের পত্নীবিয়োগ ঘটে নি।

ভীষণ সপ্রতিভ ভাবে শিপ্রা এগিয়ে এসে দুহাত জোড় করে নমস্কার করে, শুনেছিলাম ভাশুর। সেটাই ঠিক তো?

ফুল্লও হাত তুলে প্রতি নমস্কার জানিয়ে বলেন, কম নয়, পুরো আটটি মাসের বড় দাদা।

নিশ্চই ঠিক। কেন সন্দেহের কারণ আছে কিছু?

আছে।

শিপ্রা মধুর একটু হাসি হাসে। সন্দেহের কারণ চেহারা। ওর থেকে ইয়াং দেখাচ্ছে আপনাকে।

ওই তো। ওদেশের হাওয়া-বাতাস, চালচলন, দৃষ্টিভঙ্গী সবাই অবিরত বয়েসকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা চালিয়ে চলেছে যে। আরাম আর সুবিধে, এই ওদের জীবনের মূল মন্ত্র।

তা চলে এলেন কেন? ভালো দেশ, আরাম, আয়েস, সুবিধে, স্বাচ্ছন্দ্য সবই যখন রয়েছে ওখানে ছেলে বৌ যত্ন করে—

তা করে। সেটা অস্বীকার করব না। চলে এলাম—ব্যাটার সঙ্গে মতের অমিল হলো বলে।

মতের অমিল।···বললেন অম্লানকুসুম।

হঠাৎ বিরক্ত আর উত্তেজিত শোনায় ফুল্লকুসুমের গলা, হ্যাঁ, মতে পোষালনা। ব্যাটা কিনা চাকরীফাকরীর কি সব সুবিধের জন্য অ্যামেরিকান 'সিটিজেনশিপ' নিয়ে বসলো। ভীষণ চটে গেলাম। ব্যাটা তোর শুধু সুবিধেটাই বড় হলো? তোর দেশ ঘর, সমাজ, স্বজন, গোত্র পরিচয়, এক কথায় তোর অস্তিত্বটাই বিসর্জন দিয়ে তুই সুবিধে কিনতে বসলি?

বলে কিনা, 'এটা তোমার একটা ফালতু সেন্টিমেণ্ট।'···ঠিক আছে, তাই ভালো। কিন্তু তোর অবস্থাটা এখন কী? কোথাও শেকড় নেই, স্রোতের শ্যাওলা। এইতো? তুই ব্যাটা না ঘরকা, না ঘাটকা। বন্ড লিখে তো দিলি, 'আমি আর ভারতীয় নই'। তাতে ওরা কি তোকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে বলবে, 'এসো ভাই, আজ থেকে তুমি আমাদের একজন।'

ছেলে বলে, শত শত এ রকম করছে। শত শত কেন হাজার হাজার।

আমি তর্কে হারবো? বললাম করুক, তবে তারা সবাই ওই ঘরেরও নয়, ঘাটেরও নয়। সেখানেও বহিরাগত এখানে এলেও বহিরাগত। যাক, যে যার নীতিতে চলবে। আমি বললাম, তবে বাপ থাকো তোমরা, আমি ওতে নেই, গুড্‌বাই।

কথা কথা কথা।

কতদিন পরে এ রকম প্রাণ খুলে কথা বলছি রে অমু! রেখে ঢেকে মেপেজুপে কথা বলতে হবে।

এখানে কোথায় উঠেছিস ?

ঠিক কোনো একটা জায়গায় নয়। এখানে সেখানে। ভাগ্নেরা বলছে থাকো। দেখি যেন আর্টিফিসিয়াল হয়ে যাচ্ছে সবাই।

কোথায় থাকে ভাগ্নেরা ?

ওই তো একটা সল্ট লেকে, একটা পার্ক সার্কাসে।....

তোর ছেলে ?

সে তো সান্‌ফ্রানসিসকোয়।

তা ও দেশটা কেমন লাগলো ?

ভালোমন্দে মিশ্রিত।

হয়ে গেল এই এক কথায় ?

শিপ্রার স্বরে কৌতুক।···এটি তা'হলে আর এক পাগল।

শিপ্রার ভাসুর বললেন, বলতে শুরু করলে এক কথা কেন, এক লক্ষ কথাতেও কুলোবে না।···কিন্তু এতো কাণ্ড করে তোমাদের ঠিকানা জোগাড় করে এসে হাজির হলাম কি ওদেশের গল্প করতে ?···গ্রান্ড খাওয়াটা হলো, এবার একটু আরাম করে গালগল্প, কী বলিসরে অমু! এই গ্রাউণ্ড ফ্লোরে তোদের কোনো বেডরুম গেস্টরুম গোছের নেই! আমার তো আবার সিঁড়ি ওঠা—

হঠাৎ বাবার চেয়ারের পিছন থেকে বেবির হি হি শোনা যায়, তা আছে। বাপীর বৈঠকখানা ঘর আছে।

বৈঠকখানা!

ফুল্লকুসুম বলে ওঠেন এ শব্দ এখনো আছে বাংলা ভাষায়! বারে। চল তবে সেখানেই—

বেবি, দরজাটা খুলে দে—

খোলাই আছে বাপী। পি. কে. মল্লিক শুনে তুমি তখন যা ছুট দিলে—

দরজা খোলা ছিল।

'বৈঠকখানার' দরজা তো খোলা থাকাই নিয়ম।

অম্লানকুসুমের সঙ্গে সঙ্গে তার দাদা ফুল্লকুসুমও এসে দাঁড়ালেন সেই খোলা দরজার সামনে।

দাঁড়ালেন।

একটু থমকে দাঁড়িয়ে রইলেন।

তারপর হঠাৎ অম্লানকুসুমের কাঁধটা প্রায় খামচে ধরে আর্ত-নাদের মত গলায় বলে উঠলেন, অমু!

ফরাসের উপর বসে পড়েছেন ফুল্লকুসুম।

অমু! সেই বৈঠকখানাটা তো জলের তলায় তলিয়ে গিয়েছিল ···তুই কি জল সেঁচে তুলে এনে বসিয়ে দিয়েছিস?

দাদা! তুই বুঝতে পারছিস?

বুঝতে পারবোনা? বলিস কী কোথাও তো কোনো খুঁৎ রাখিস নি।···অমু।

গোল ডুম দেওয়া ওই কাঁচের দেওয়াল আলোগুলো কোথায় পেলি রে?...অমু, ছাতা আর ছড়ি ঝুলিয়ে রাখবার এই কাঠের দেওয়াল আলনাটা জঙ্গীপুরের কোনখান থেকে কুড়িয়ে আনিস নি তো? আর এই ছাতা আর ছড়ি? এসব কার অমু?

অসম্ভব চাঞ্চল্য অনুভব করছেন ফুল্লকুসুম। অমু, দেওয়ালে টাঙানো ওই পটগুলোও কি তোর নতুন কেনা?···ওই সামনের দেওয়ালে দুর্গা। এদিকে কালী, জগদ্ধাত্রী, গঙ্গাবতরণ, দুর্বাসার অভিশাপ, এদিকের দেওয়ালে লাল শাড়ি পরা লক্ষ্মী। অমু, আমার যে তোকে পুজো করতে ইচ্ছে করছে। নাঃ তুই-ই ধন্য।

তোর এতো ডিটেলস মনে রয়েছে ফুলু।

ফুল্লকুসুম অন্যমনস্কের মত বলে ওঠে, জানিনা মনে রয়েছে কিনা, কিন্তু যেই এই দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম। মনে হলো যেন ভেতরে একটা ভুমিকম্প ঘটে গেল।···আমি হারিয়ে গেলাম। জঙ্গীপুরের সেই বৈঠকখানা ঘরটাকে হঠাৎ চোখের সামনে দেখে, মনে হল, আমি কি ম্যাজিক দেখছি।···অমু, ওই লক্ষ্মী ঠাকুরের

ছবির নিচে যে দুটো লাইন লেখা রয়েছে সেটা এখান থেকে পড়া যাচ্ছে না। তবু আমি বলে দিতে পারবো—লেখা আছে 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী, বাণিজ্যই সার, ধরোনো পরোনা গলে অধীনতা হার।' বল ঠিক বলেছি কিনা?

অম্লানকুসুম তাঁর আট মাসের বড় দাদার হাতটা বন্ধুর হাতের মতই চেপে ধরেন, কারেক্ট। ফুল্ল, তাহলে তুইও ভুলিসনি।

আবার অন্যমনা হলেন ফুল্লকুসুম, বললাম তো জানিনা, ভুলে গিয়েছিলাম না ভুলে ছিলাম।···অমু, আমার কেঁদে ফেলতে ইচ্ছে করছে।...দেওয়াল আলমারিতে এই সব মোটা মোটা পুরনো পুরনো ডাক্তারী বই পেলি কোথায় অমু? পুরনো পুরনো ল' বুক।

সে অনেক ইতিহাস। অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে অনেক চেষ্টা করে পুরনো বইয়ের দোকানে অর্ডার দিয়ে···

কিন্তু ফুল্লকুসুমের যে বিস্ময়ের চমক কাটতে চায়না। অমু, আবার গড়গড়াও?

ওটা একসময়ে লক্ষ্মৌ বেড়াতে গিয়ে শখ করে কেনা। গিন্নি ভাঙ্গা জঞ্জালের সঙ্গে ফেলে দিয়েছিল—

অমু অমুরে! আবার টানাপাখাও? না, তোকে আমার পুজো না করে উপায় নেই।···

অম্লানকুসুমেরও কি কেঁদে ফেলতে ইচ্ছে করছে না?···মনে রেখেছে ফুলুও, পুঙখানুপুঙখ মনে রেখেছে।···অথবা তা নয়। ঠিক অম্লানকুসুমেরই মত। পেন্সিলের হিজিবিজি স্কেচটা ক্রমশঃই রঙে রেখায় স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে।···

অমু তক্তপোষের ছটা পায়ার তলায় ছ'খানা থান ইঁট দেওয়া ছিল সেটাও রেখেছিস?···অমু, মনে হচ্ছে, ওই বেঞ্চগুলোর উপর এবার একে একে এসে বসবে, শশধর কাকা, নীলমনী দাদু, ভটচাযি্য মশাই, আবদুল চাচা, কাসেম মিঞা।

ফুলু, এবার আমি হেরে গেলাম, সব নামগুলো মনে ছিল না আমার।…

তুই তো তাও একটু ছোট ছিলি।…তাছাড়া তুই তো পড়ার জন্য কলকাতা চলে গেলি।…

দরজা খোলা ছিল। খোলা জমির দিকের পাখি খড়খড়ির পাল্লা-দার জানলাটাও খোলা ছিল। সেখান থেকে রোদ মেশানো নতুন হিমের হাওয়া এসে এসে ঝাপটা মেরে যাচ্ছিল। ফুল্লকুসুম নামের দীর্ঘদিন বিদেশে বাস করে আসা প্রৌঢ় লোকটা ছেলেমানুষের মত হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠেছে, অমু! হাওয়াটাকেও কি তুই কৌটোয় ভরে তুলে রেখেছিলি? অবিকল সেই রকম যে রে।....

অমু, মৃদু হেসে বলে, হাওয়া থাকে, গাছেরা থাকে। থাকে পাতারা, ফুলেরা, ফলেরা। মানুষকেই শুধু হারিয়ে ফেলতে ফেলতে এগিয়ে যেতে হয়।…দুখানা থান ইঁট নিয়ে এসে চৌকির পায়ার নীচে বসিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু দুটো দুষ্টু দুর্দান্ত ছেলেকে কি ওই জানালার বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে উঁকি দেওয়ানো যায়?

ক্রমশঃ বেলা পড়ে আসে, বাতাস আরো হিমেল হয়ে আসে। তবু কেউই জানলাটা বন্ধ করতে ওঠেন না।

তাকিয়ে থাকেন ওই খোলা বাইরেটার দিকে।

হঠাৎ কেমন চঞ্চল হন ফুল্লকুসুম। অমু, বলতে লজ্জা পাচ্ছিলাম, ঢোকা থেকে বাবার গায়ের গন্ধ পাচ্ছি। বলেই ফেললাম। কী ব্যাপার বলতো।

অম্বুরী তামাকের গন্ধ রে দাদা! গন্ধটার সঙ্গে তো জ্যাঠামশাই মাখানো।

কে খায় তামাক?

কেউ না।

অম্লানকুসুম হাসেন। খানিকটা কিনে রেখেছি, কৌটোর মুখটা খুলে রেখে দিলে গন্ধটা বাতাসে ছড়ায়। মনে হয় যেন, জ্যাঠামশাই তাকিয়ায় ঠেশ দিয়ে—

ফুল্লকুসুম আর একবার তখনকার মত অম্লানকুসুমের কাঁধটা চেপে ধরেন। আজ আমি তোর এখানে থাকব।···এই ঘরে দু'জনে শোবো। আর সারারাত জেগে গল্প করব।....সেই সব দিনের গল্প। যখন এই পৃথিবীতে আমরা ছিলাম, আমাদের সব ছিল। এ যুগ ভাবে "এ হতভাগ্যরা হতদরিদ্র নিঃস্ব"।....কেবলমাত্র ওদের দয়ার কাঙাল।

অম্লানকুসুম এ কথার কোনো উত্তর দেননা, শুধু দাদার সেই হাতটার উপর একটা হাত রেখে একটু চাপ দেন।

আচ্ছা, দীর্ঘদিন ধরে অম্লানকুসুম নামের মানুষটার মধ্যে পৃথিবীর নিষ্ঠুর নির্লজ্জতা আর মানুষের ব্যঙ্গবিদ্রূপ তিক্ততা এবং অবিশ্বাস বিশ্বাসঘাতকতার ধাক্কায় ধাক্কায় যে গভীর ধ্বংসের সৃষ্টি করে চলেছিল, সেটা হঠাৎ ভরাট হয়ে উঠল কোন যাদু দণ্ডের ছোঁওয়ায়?

ঘণ্টা কয়েক আগেও যে গভীর শূন্যতা অম্লানকুসুমকে একটা নিঃসীম অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছিল, সেই শূন্যতাটা মিলিয়ে গেল কোন শূন্যে?

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে। তবু সমস্ত ভুবন জুড়ে যেন একটা আলোর সমারোহ, যেন একটা পরমপরিপূর্ণতার স্বাদ।

—শেষ—